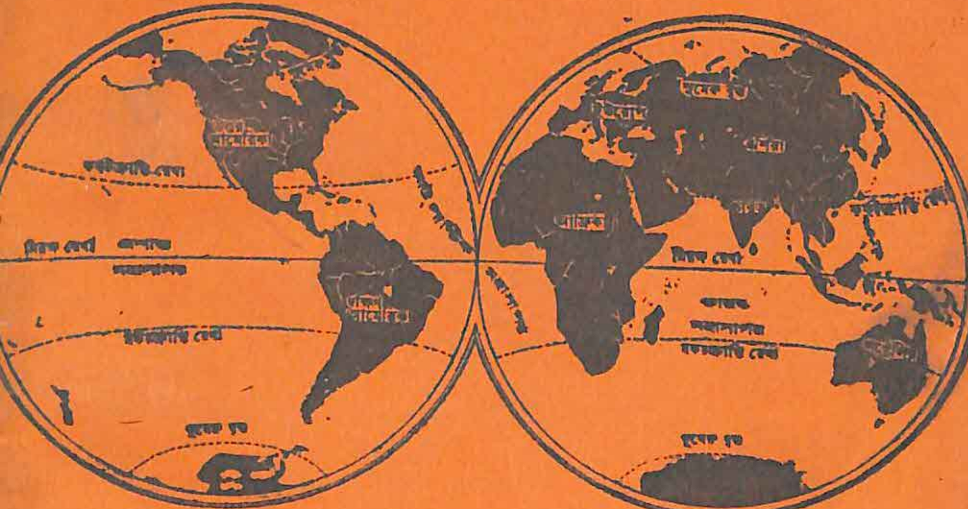
ভারত ও ভূমণ্ডল

দ্বিতীয় পর্যায়

সপ্তম শ্রেণীর জন্য



শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় এম.এ.,বি.টি
ও
৺সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি.এস-সি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত।

ভারত ও ভূমণ্ডল

—ঃ দ্বিতীয় পর্যায় ঃ—

সপ্তম শ্রেণীর জন্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, কালীহাতী (ময়মনসিংহ) উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ও ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত কেওড়াতলা শরৎচন্দ্র মেমোরিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় এম্. এ., বি. টি.

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইন্‌স্টিটিউটের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক

৺সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি. এস্-সি.

ইস্টার্ন পাবলিশার্স

৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
শ্রীশেফালিকা রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

"This book has been printed on paper alloted by Government of India at concessional rate."

প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪
পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৫

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক নির্ধারিত সপ্তম শ্রেণীর ভূগোলের নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত "ভারত ও ভূমণ্ডল" (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে নূতন পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিবার সুবিধার জন্য যথাস্থানে প্রয়োজনীয় চিত্র ও মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। পরিসংখ্যান-বিষয়ক তথ্যসমূহ যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে ও সহজবোধ্য করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। **ভারত ও ভূমণ্ডল**-এর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে পুস্তকখানি সুধী শিক্ষাব্রতিগণের নিকট সমাদৃত ও স্নেহাস্পদ শিক্ষার্থিবৃন্দের আশানুরূপ ফলপ্রদ হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা
১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪

বিনীত
গ্রন্থকার

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

77/2, PARK STREET, CALCUTTA—700016

REORGANISED PATTERN OF SECONDARY EDUCATION

FROM 1974

SYLLABUS IN GEOGRAPHY

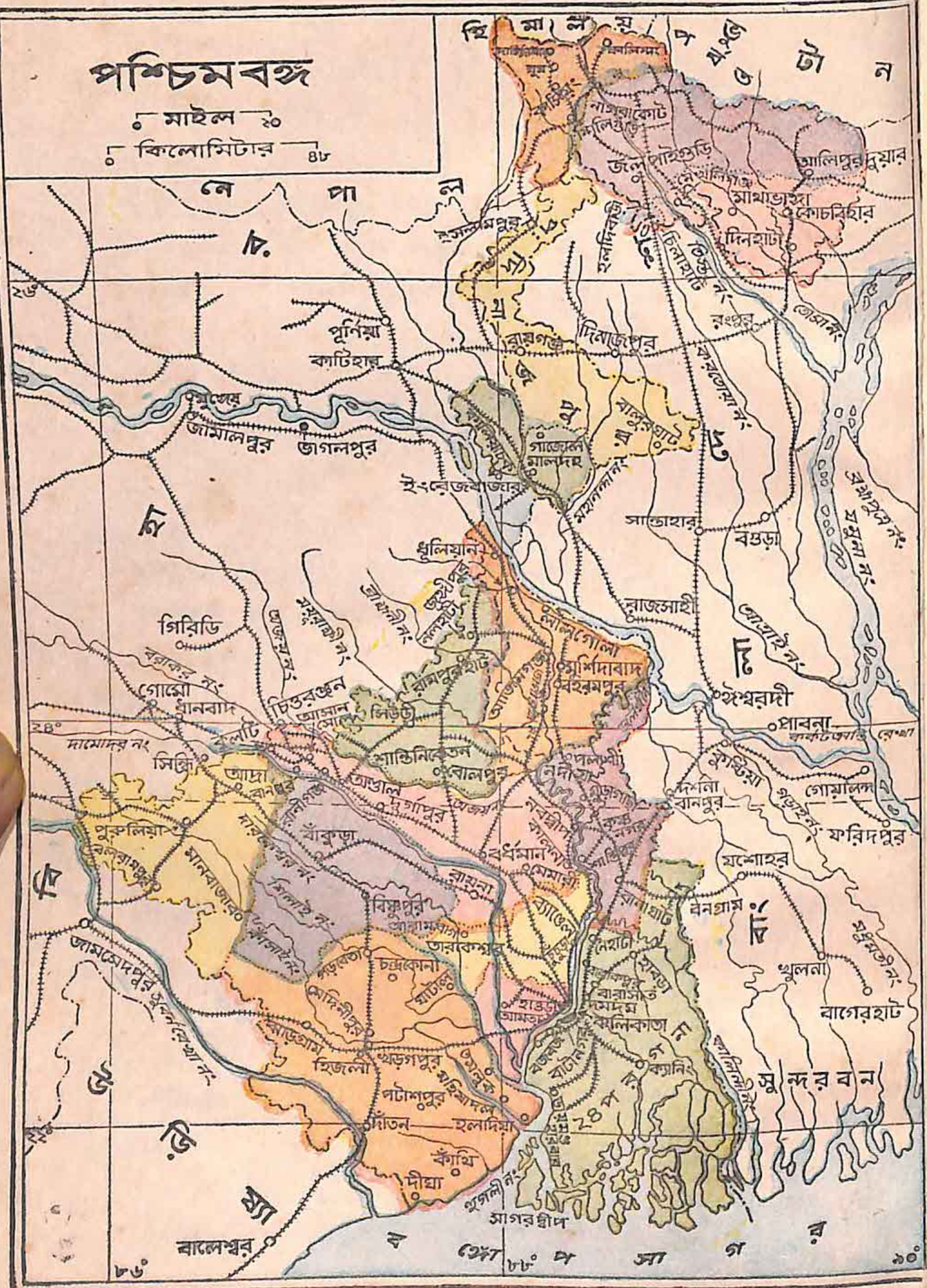
CLASS VII

64 pages (50 pages reading matter and 14 pages maps, charts, diagrams, photographs etc.) Size $22'' \times 32''$ $\frac{1}{16}$th & pica type. 10% variation allowed as usual.

1. Situation of West Bengal in relation to the neighbouring states and countries. [2 pages]
2. A Geographical study of the following areas of West Bengal:

   The Mountainous tracts of Jalpaiguri and Darjeeling, the Western Plateau area, the Northern and Southern plains, the Sundarbans and the costal dune tracts of Midnapore. The divisions mentioned above should be explained with the help of a Map of Districts of the State. [20 pages]
3. The development plans of West Bengal with brief reference to irrigation, flood control, development of communication, industries and trade. [28 pages]

সূচীপত্র



পশ্চিমবঙ্গ
মাইল
কিলোমিটার
নে পা ল
হি মা ল য়
পূর্ণিয়া
কাটিহার
মুঙ্গের
জামালপুর
ভাগলপুর
ইংরেজবাজার
মালদহ
গিরিডি
গোমো
ধানবাদ
চিত্তরঞ্জন
আসানসোল
সিউড়ী
রামপুরহাট
শান্তিনিকেতন
বোলপুর
আদ্রা
সিন্ধ্রি
দামোদর নং
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
দুর্গাপুর
বিষ্ণুপুর
বর্ধমান
নবদ্বীপ
রানাঘাট
নৈহাটী
বারাসাত
দমদম
কলিকাতা
ক্যানিং
চন্দ্রকোনা
মেদিনীপুর
ঝাড়গ্রাম
হিজলী
খড়গপুর
তমলুক
পটাশপুর
হলদিয়া
কাঁথি
দীঘা
সাগরদ্বীপ
বালেশ্বর
জামসেদপুর
আলিপুরদুয়ার
কোচবিহার
দিনহাটা
জলপাইগুড়ি
শিলিগুড়ি
দিনাজপুর
রায়গঞ্জ
বালুরঘাট
রংপুর
সান্তাহার
বগুড়া
রাজসাহী
লালগোলা
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
ঈশ্বরদী
পাবনা
গোয়ালন্দ
ফরিদপুর
যশোহর
বনগ্রাম
খুলনা
বাগেরহাট
সুন্দরবন
ব ঙ্গো প সা গ র

ভারত ও ভূমণ্ডল

প্রথম অধ্যায়

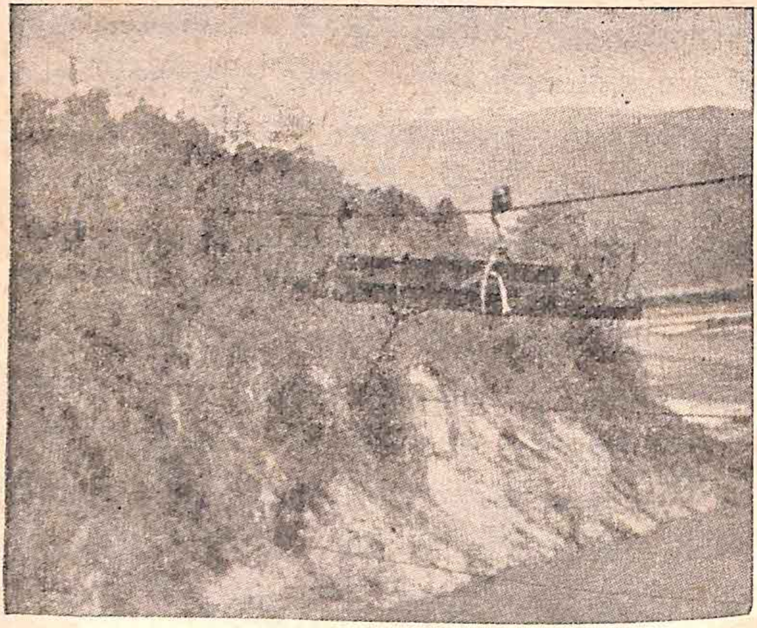
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান
এবং
প্রতিবেশী রাজ্য ও দেশসমূহের সহিত ইহার সম্পর্ক

ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্যপাল শাসিত রাজ্য। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কি-মি., লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষের কিছু বেশী।* এই রাজ্যের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্বে আসাম, মেঘালয় ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বিহার ও নেপাল।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজ্যের পূর্বে **আসাম রাজ্য** ও স্বাধীন **বাংলাদেশ** রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। পশ্চিমে বিহার খনিজ সম্পদে পুষ্ট। **নেপাল** একটি স্বাধীন দেশ, ইহারও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে **ভুটান ও সিকিম** দুইটি পার্বত রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রচুর নহে। দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা রাজ্যেও খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে। পর্বত শ্রেণীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ নেপাল, ভুটান ও সিকিম এই তিনটি পার্বত দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ফলে ইহাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তথাপি মানুষ স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধিবলে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছে। দার্জিলিং হইতে পার্বত পথে নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে যাওয়া যায়। বিমানপথে কাঠমণ্ডুর সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগ আছে।

* ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের লোকগণনানুসারে।

নকসালবাড়ি (শিলিগুড়ি) হইতে মেচি নদী পার হইয়া নেপালে যাওয়া যায়। শিলিগুড়ি হইতে মোটরপথে সিকিম এবং ঐ স্থান হইতে ডুয়ার্সের মধ্য দিয়া ভুটানের ফুন্টোসোলিং ও পারো পর্যন্ত যাওয়া যায়। থিম্ফু হইতে পারো পর্যন্ত ভুটান সরকারের নির্মিত পথে ভারত সরকার ভুটানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এই সকল পার্বত পথ শীতকালে বরফাবৃত থাকে এবং বর্ষাকালে ধ্বস নামিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কেবল গ্রীষ্মকালেই এই সকল পথে চলাচল সুবিধাজনক। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে দার্জিলিং-এ রজ্জুপথের



রজ্জুপথ

(Ropeway) সাহায্যে যাত্রী ও মালপত্র পরিবহনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কালিম্পং-এও রজ্জুপথ আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী

পার্বত দেশগুলির সহিত পশম, পশু চর্ম, হাতীর দাঁত, গণ্ডারের শিং, হরিণের শিং, মৃগনাভি, আলু, কমলালেবু, আপেল, এলাচি ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে। নেপাল, ভুটান ও সিকিম শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত নহে। তথাপি এই সকল দেশের সহিত ভারত সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি উহাদিগকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত অনুপ্রেরণা দিতেছে।

বিহারের কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনিজ দ্রব্য, উড়িষ্যার লৌহ আকরিক পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকারখানার জন্য আনয়ন্ করা হয়। আসাম হইতে এণ্ডি, মুগা, তসরের বস্ত্র ও চা পশ্চিমবঙ্গে প্রেরিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী **বাংলাদেশ** কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র। এই দেশের কৃষিসম্পদের মধ্যে **ধান ও পাট** প্রধান। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট পাট বাংলাদেশেই জন্মে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাট শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎকৃষ্ট পাট আমদানি করেন। স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথ দ্বারা বাংলাদেশের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ আছে।

কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর, দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ কলিকাতা বন্দরের **পশ্চাদ্‌ভুমি**। এই সকল রাজ্যের সহিত কলিকাতা সড়ক, রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথ দ্বারা সংযুক্ত। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা, কয়লা ও পাটজাত দ্রব্য ; বিহারের তৈলবীজ, লাক্ষা, কয়লা, চর্ম, লৌহ আকরিক, অভ্র ; উড়িষ্যার লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং বিদেশ হইতে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য পশ্চাদ্‌ভূমিতে প্রেরিত হয়। কলিকাতার উপকণ্ঠে **দমদম** একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানপথের বিখ্যাত স্টেশন। এই বিমানবন্দর হইতে বিমানপথে

দার্জিলিং এবং আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাভূমি প্রভৃতি রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। আশেপাশের রাজ্যসমূহ, পার্বত অঞ্চলের তিনটি দেশ এবং বাংলাদেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পক্ষে সহায়ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভৌগোলিক বিবরণ

সূচনা

শাসন কার্যের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; বিভাগগুলি ১৫টি জেলা লইয়া গঠিত। যথা—

(ক) **প্রেসিডেন্সি বিভাগ**—(১) কলিকাতা, (২) ২৪ পরগনা, (৩) নদীয়া, (৪) মুর্শিদাবাদ, (৫) হাওড়া।

(খ) **বর্ধমান বিভাগ**—(১) বর্ধমান, (২) বীরভূম, (৩) বাঁকুড়া, (৪) পুরুলিয়া, (৫) হুগলী, (৬) মেদিনীপুর।

(গ) **জলপাইগুড়ি বিভাগ**—(১) জলপাইগুড়ি, (২) দার্জিলিং, (৩) কুচবিহার, (৪) মালদহ, (৫) পশ্চিম দিনাজপুর।

উক্ত তিনটি বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলি পশ্চিমবঙ্গের পার্বত, মালভূমি ও সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাদ্বয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে **পার্বত অঞ্চলে** অবস্থিত। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ **মালভূমি অঞ্চলের** অন্তর্গত। এই অঞ্চল ছোটনাগপুর মালভূমির সম্প্রসারণ ভূমি। কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর মালদহ গঙ্গার **উত্তরদিকের সমভূমির** অন্তর্গত এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া,

বীরভূম ও বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা, কলিকাতা প্রভৃতি গঙ্গার **দক্ষিণ দিকের সমভূমির** অন্তর্গত। ইহা ভিন্ন, ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশের ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ যথাক্রমে **সুন্দরবন ও মেদিনীপুর উপকূলের বালিয়াড়ি** অঞ্চলের অন্তর্গত। অঞ্চল কয়েকটির সংক্ষিপ্ত **ভৌগোলিক বিবরণ** নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রথম পাঠ

(ক) জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চল

ভূ-প্রকৃতি—জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে উপ-পার্বত অঞ্চলে অবস্থিত। এই জেলার



জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চল

আলিপুরদুয়ারের উত্তরপূর্বে ছোট ছোট পাহাড় আছে। বনভূমি দেখা যায় এই অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র। উহাকে **ডুয়ার্স** বনাঞ্চল বলা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশের ভূমি কিছুটা উঁচু, সেখানে **সিঞ্চুলা**

পাহাড় (১,৮০০ মি.) অবস্থিত। এই অঞ্চলের বনভূমি পশ্চিমদিকের তরাই বনের সহিত যুক্ত। এই জেলার দক্ষিণাংশ নিম্ন সমতলভূমি। সেই কারণে উত্তরের পার্বত অঞ্চলের নদীগুলি খাড়াভাবে দক্ষিণের সমভূমির দিকে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে ধ্বস নামিয়া সমভূমির নদীখাত ভরাট হইয়া যায় এবং হিমালয়ের জল প্রবল বেগে নদীখাত দিয়া বহিতে থাকে। ফলে, বর্ষার বাড়তি জল অগভীর নদী-খাত ধারণ করিতে অক্ষম হয় বলিয়া বর্ষাকালে জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীতে ভীষণ বন্যা হয়। বন্যার সময় জলপাইগুড়ি জেলার সদরের সহিত ডুয়ার্সের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। **তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, রায়ডাক, সংকোশ** প্রভৃতি নদী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া জলপাই-গুড়ি জেলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া **মহানন্দা** নদী প্রবাহিত হইতেছে।

জলবায়ু—জলপাইগুড়ি জেলায় গ্রীষ্মকালীন গড় **তাপমাত্রা** ২৯°—৩৩° সে., শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ১৭°—২৪° সে.। গ্রীষ্মের আর্দ্র মৌসুমী বায়ু হিমালয়ের গাত্রে বাধা পায় বলিয়া দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত অঞ্চলে অধিক **বৃষ্টিপাত** হয়। এই অঞ্চলে ৩৩৫ সেন্টিমিটারের বেশী বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত বনভূমিতে শাল, সেগুন, গর্জন, জারুল, পোমা, গামাইর, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ এবং বাঁশ ও বেত প্রচুর জন্মে। **শাল** ও **সেগুন** কাঠ খুব মূল্যবান।

কৃষিজাত দ্রব্য—প্রচুর বৃষ্টিপাত, জলসেচের সুবন্দোবস্ত এবং পলিময় উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত সমভূমি এই জেলার কৃষিকার্যের পক্ষে খুবই উপোযোগী ; সমতল ভূমিতে **ধান, পাট, তামাক, সরিষা, তৈলবীজ** প্রভৃতির চাষ হয়। **কমলালেবু** এখানকার পাহাড়ের ঢালে প্রচুর

জন্মে। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে শতাধিক **চা**-বাগান আছে। চা বিদেশে রপ্তানি হয় এবং ইহাতে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ডুয়ার্সের চা-এর চাষ গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ সম্পদ—জলপাইগুড়ি জেলায় **লিগনাইট কয়লা** পাওয়া যায়। এই কয়লায় জলীয় বাষ্প ও গ্যাস বেশী মাত্রায় থাকে, এইজন্য ইহার তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা কম। ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। এই কয়লার রং বাদামী বলিয়া ইহাকে বাদামী কয়লাও বলা হয়। ইহা ব্যতীত, জলপাইগুড়ি জেলার বক্সায় তামা, ডুয়ার্সে ডলোমাইট ও চুনাপাথর পাওয়া যায়।

শিল্প—চা-শিল্পই এই জেলার সর্বপ্রধান শিল্প। এই জেলার আর্থিক উন্নতি প্রধানত এই শিল্পের উপরই নির্ভরশীল। পার্বত অঞ্চলের



চা-পাতা তোলার চিত্র

চা-বাগানে লক্ষাধিক স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। নেপালী, ভুটিয়া ও লেপ্‌চারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই চা-বাগানে শ্রমিকের কাজ করে। চা-এর পাতা ও কুঁড়িগুলি কারখানায় নানাবিধ প্রক্রিয়ায় শুকাইয়া লইবার

পর যে চা প্রস্তুত হয় তাহাকে কালো চা বলে। চা-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া **প্লাই-উড ও চা-এর বাক্স** তৈয়ারি করিবার অনেক কাঠের কারখানা এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ভিন্ন, এই জেলায় নানাবিধ **কুটীর** শিল্পের মধ্যে তাঁত শিল্প, বর্ষাতি ও মাথার টুপী নির্মাণ, **কাষ্ঠদ্রব্য** নির্মাণ, বাঁশ, বেত, শোলা প্রভৃতি দ্বারা সৌখিন দ্রব্য নির্মাণ, মৃৎশিল্প, হাঁস, মুরগী পালন (Poultry Farming) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জীবজন্তু—এই জেলার তোর্সা নদীর তীরে জলদাপাড়ার সংরক্ষিত **অভয়ারণ্যে** (Jaldapara Sanctuary) বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ,



চিতা বিড়াল

ভালুক, একশৃঙ্গ গণ্ডার, হাতী, বাইসন, গয়াল, বন্য মহিষ, বন্যশূকর, সম্বর প্রভৃতি নানাজাতের বন্যজন্তু বাস করে। এই অঞ্চলের চিতা বিড়াল

একটি দুর্লভজাতীয় প্রাণী। বক্সার বনাঞ্চলেও বহু বন্যপ্রাণী বাস করে। ভ্রমণকারীরা এই অরণ্যে বন্যজন্তু দেখিতে যান।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। বাঙ্গালী হিন্দুদের সংখ্যা অধিক। তাহার পরেই মুসলমানদের স্থান। খ্রীস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীর লোকেরা সংখ্যায় অল্প। তাহারা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজকর্মে নিযুক্ত আছে। এই জেলায় শতকরা ৩০ জন তফসিলী জাতির লোকের বাস। তাহাদের মধ্যে রাজবংশীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহারা কৃষিজীবী এবং মৎস্য-শিকারী। পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলাতেই তফসীলভুক্ত লোকেরা সংখ্যায় বেশী। কোরা, লোধা, মাহালি, মেচ, মুণ্ডা, ওরাওঁ, রাভা (Rabhas), সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি তফসিলী জাতির লোকেরা এই জেলার অধিবাসী। টোটো নামক উপজাতির লোকেরাও এখানে বাস করে, তাহারা সংখ্যায় অল্প। জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চলে কীচক নামক উপজাতির বাসও আছে। তাহারা পেশায় ঝাড়ুদার ও পশুপাখী শিকারী।

নগর—জলপাইগুড়ি জেলার দুইটি মহকুমা—জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। **জলপাইগুড়ি** জেলার সদর। এখানে বিভাগীয় কমিশনার বাস করেন। **আলিপুরদুয়ার** বিখ্যাত রেলস্টেশন। **বক্সা** বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনানিবাস।

(খ) দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চল

ভূ-প্রকৃতি—পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলে দার্জিলিং জেলা অবস্থিত। এই জেলার উত্তরাংশ পর্বতময় ও বন্ধুর। পর্বতশ্রেণীর মাঝে মাঝে গভীর উপত্যকা আছে। এই জেলার উত্তর-পশ্চিমে সিংগলীলা পর্বতের শৃঙ্গ **সান্দাকফু** (৩,৬৩০ মি.) ও **ফালুট**

(৩,৫৯৬ মি.) অবস্থিত। পার্বতভূমির দক্ষিণে মালভূমি। ইহার দক্ষিণে উচ্চ সমভূমি। এখানকার ভূমি উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু হইয়াছে। দার্জিলিং-হিমালয় হইতে **তিস্তা** নদী দার্জিলিং-এ গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা দার্জিলিং জেলাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে; পূর্বাংশে কালিম্পং মহকুমা, পশ্চিমাংশে দার্জিলিং ও কার্সিয়াং মহকুমা। **মেচি, বালাসন, মহানন্দা, জলঢাকা,**



দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চল

রঙ্গিত বা **রঙ্গত** প্রভৃতি নদী দার্জিলিং হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নদীগুলি খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে, কিন্তু এই সকল নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার সুযোগ আছে। জলঢাকা নদীর খরস্রোত

হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া উত্তরবঙ্গে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে।

জলবায়ু—পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশী। শীতকালে এখানে তুষারপাত হয়। গ্রীষ্মকালে (জুন-জুলাই মাসে) বৃষ্টিপাত বেশী, শরৎকালেই নাতিশীতোষ্ণ মনোরম আবহাওয়া থাকে। উচ্চতার জন্য দার্জিলিং-এ গ্রীষ্মকালে শিলিগুড়ি অপেক্ষা গরমের মাত্রা অনেক কম থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা গড়ে ১৪°—১৮° সে. তবে উচ্চতা অনুসারে তাপমাত্রা কমিয়া যায়। শীতকালে পার্বত অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ২° সে. এবং উত্তরাংশে ০° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা নামিয়া যায়। গ্রীষ্মের আর্দ্র মৌসুমী বায়ু হিমালয়ের গাত্রে বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রচুর বারিবর্ষণ করে (৩০০—৩৮৪ সে-মি.)। উচ্চতার জন্য দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং প্রভৃতি পার্বত শহরে জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—পর্বতের পাদদেশে **তরাই** অঞ্চলের **চির হরিৎ** বৃক্ষের মিশ্র বনভূমিতে **শাল, সেগুন,** গর্জন, জারুল, **শিশু,** বাঁশ, বট, হলুদ, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। ইহারা **পর্ণমোচী** বৃক্ষ অর্থাৎ শীতকালে ইহাদের পাতা ঝরিয়া পড়ে। আসবাবপত্র নির্মাণে ও জ্বালানি হিসাবে এই সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। উত্তরাংশে হিমালয়ের গাত্রে পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি **সরলবর্গীয়** বৃক্ষ জন্মে। পাইন-জাতীয় বৃক্ষ হইতে তার্পিন তৈল, রজন এবং কাঠ হইতে প্যাকিং বাক্স, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। হিমালয় গাত্রের উচ্চ অংশে **আল্পীয় বনভূমি** ও রডোডেনড্রন গাছ দেখা যায়। আরও উর্ধ্বে চিরতুষার।

কৃষিজাত দ্রব্য—পর্বতের উপরকার মাটি অপেক্ষা পাদদেশের মাটি উর্বর। পার্বত অঞ্চলের উচ্চাংশের **মৃত্তিকা** কাঁকর মিশ্রিত ও

পড্‌সল জাতীয়। এই মাটির রঙ ধূসর ও বাদামী। এই মাটির অম্লত্ব বেশী বলিয়া ইহা অনুর্বর। পর্বতগাত্রে কিছু জুমিং বা জুম চাষ হয়। পর্বতের পাদদেশের সমতল ভূমিতেই ধানের চাষ ভাল হয়। ধান্য ব্যতীত এখানে ভুট্টার চাষও হয়। ইক্ষু, আনারস, সরিষা ইত্যাদিরও সামান্য চাষ হয়। লেপচা, ভুটিয়া ও নেপালীরা চাষ-আবাদ করে। নিম্ন উপত্যকায় লেপচারা কমলালেবু ও এলাচির চাষ করে। মংপুতে **সিঙ্কোনার** ও কালিম্পং-এ বড় **এলাচি** ও **অন্যান্য** মসলার চাষ ভাল হয়। দার্জিলিং-এর প্রধান কৃষিজ সম্পদ **চা**। এখানে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট চা জন্মে।

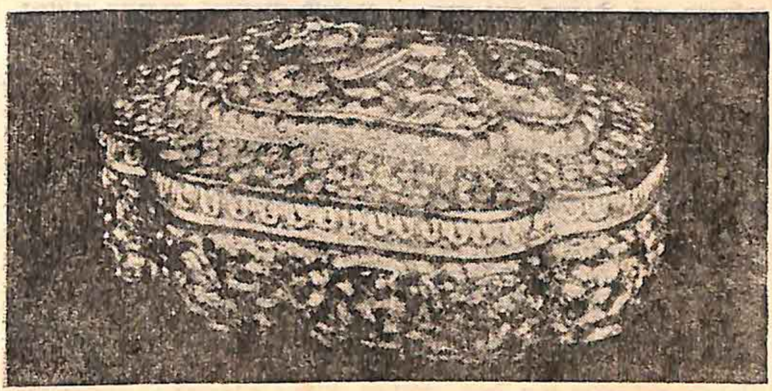


লেপচা রমণী

খনিজ সম্পদ—দার্জিলিং জেলায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। এতদ্‌-ব্যতীত, এখানে লৌহ প্রস্তর, চুনাপাথর গ্রাফাইট, সোপস্টোন, কেওলিন এবং কিছু পরিমাণ তাম্র পাওয়া যায়।

শিল্প—চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ভারতে দ্বিতীয় হইলেও চা-শিল্পে এই রাজ্যের স্থান প্রথম। দার্জিলিং জেলায় শতাধিক চা-বাগান আছে।

দার্জিলিং-এর চা স্বাদে ও গন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট এবং বাজারে বেশী দামে বিক্রয় হয়। চা অর্থপ্রসূ ফসল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চা রপ্তানি করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। চা-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এখানে কিছু সংখ্যক কাঠের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দার্জিলিং জেলায় অন্য কোন বৃহদায়তন শিল্প নাই। এখানে নানারকম কুটীর শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভুটিয়া, লেপচা, নেপালী, লোধা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকেরা কৃষিকার্য ব্যতীত বাঁশ ও বেতের সাহায্যে



হস্তশিল্পের কারুকার্য

ঝুড়ি, মোড়া, তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর উপর কারুকার্য, পাথরের অলঙ্কার নির্মাণ ইত্যাদি নানারকম হস্ত শিল্পের কাজ করে। ইহা ছাড়া কাঠের সাহায্যে নানারকম সৌখিন দ্রব্য নির্মাণেও তাহারা দক্ষ।

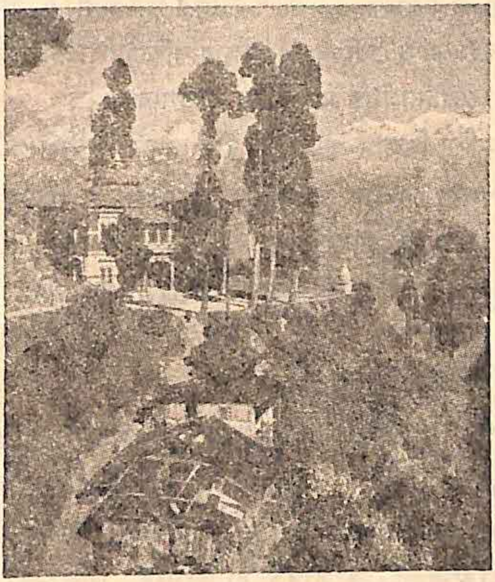
জীবজন্তু—তরাই-এর বনভূমিতে বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, নানা জাতের হরিণ বাস করে। অসংখ্য রঙ বেরঙের পাখী এই জেলায় দেখা

যায়। বনভূমির স্থানে স্থানে প্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চল (Sanctuaries) আছে।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—দার্জিলিং জেলার পার্বত অঞ্চলে কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব, বিদ্যুৎ-শক্তির অভাব এবং যাতায়াতের সুবিধা তেমন না থাকায় সেখানে লোকবসতি কম। চাষ-আবাদ ব্যতীত **চা-শিল্প, পশুপালন, পশুচারণ ও হস্তশিল্প** অধিবাসীদের উপজীবিকা। কালিম্পং-এর শিল্প-কেন্দ্র (Arts and Crafts Industrial Society) পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে হস্তশিল্পে দক্ষতা অর্জন করিবার জন্য উৎসাহ দান করে। অবশিষ্ট লোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরি ও অন্যান্য কাজকর্মে নিযুক্ত। ভ্রমণকারীরা প্রতি বৎসর স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস দার্জিলিং-এর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের সমাগমে এখানে **পর্যটন-শিল্প**ও গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জেলাতেও অল্পসংখ্যক তপশীল ও উপজাতির লোক বাস করে। যেমন—রাজবংশী, নমঃশূদ্র, লোহার, কৈবর্ত, চামার, মেথর, ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি। এখানে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা আছে। কয়েকটি বিখ্যাত ইউরোপীয় বিদ্যালয় এই জেলায় স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। **নেপালী** ভাষা এখানকার প্রধান ভাষা। শিলিগুড়িতে বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষা প্রচলিত।

নগর—দার্জিলিং শহরটি (২,২৩৩ মি.) হিমালয়-ক্রোড়ে অবস্থিত। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস ও স্বাস্থ্যকর স্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য দার্জিলিংকে Queen of Hills বা 'পাহাড়ের রাণী' বলা হয়। টাইগার হিল (২,৬১৫ মি.) হইতে হিমালয়ের শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার (৮,৫৯৮ মি.) বরফাবৃত দেহের উপর সূর্যোদয়ের অপরূপ দৃশ্য বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকর্ষণের বস্তু। দার্জিলিং-হিমালয়

রেলপথে ঘুম একটি পার্বত রেলস্টেশন। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশন। দার্জিলিং-এর 'অবজারভেটারি হিল', 'লয়েড বোটানিক্যাল



দার্জিলিং-এর দৃশ্য

গার্ডেনস্', 'ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্', 'বৌদ্ধমঠ', 'হিমালয় ইনষ্টিটিউট' প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। কার্সিয়াং (১,৪৮০ মি.) স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানে বেতার-স্টেশন আছে।

কালিম্পং (১,৫৬০ মি.) স্বাস্থ্যকর স্থান ; এখানে বৌদ্ধমঠ, হিন্দু মন্দির ও মুসলমানদের মসজিদ আছে। তিব্বতীয় পশুলোমের বাজারের জন্য ইহা বিখ্যাত। শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমান স্টেশন কলিকাতা ও দার্জিলিংকে বিমানপথে সংযুক্ত করিয়াছে।

দ্বিতীয় পাঠ

পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল

প্রাকৃতিক বিবরণ—পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল। ইহা ছোটনাগপুর মালভূমির সম্প্রসারণ মাত্র। এই অঞ্চলের মাঝে মাঝে কঠিন শিলা (গ্রানাইট, নীস্ প্রভৃতি) দ্বারা গঠিত পাহাড় আছে। পুরুলিয়া জেলার **বাঘমুণ্ডি, অযোধ্যা ও পাঞ্চেৎ** পাহাড় এবং বাঁকুড়া জেলার **বিহারীনাথ, শুশুনিয়া** পাহাড় উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমভাগের ভূমি কিছুটা উঁচু ও অসমতল। বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিমাংশে লৌহ মিশ্রিত লাল রং-এর মৃত্তিকা ও কাঁকর দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের মালভূমি অঞ্চলটি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু হইয়া গিয়াছে। ফলে, নদীগুলির ঢাল অনুসারে পশ্চিম হইতে পূর্ববাহিনী হইয়াছে। **ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর,** কংসাবতী বা **কাঁসাই, শিলাবতী** বা **শিলাই** প্রভৃতি নদ-নদী ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের অন্তর্গত বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী বা হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। দ্বারকেশ্বর ও শিলাই নদীর মিলিত নাম **রূপনারায়ণ**। রূপনারায়ণ এবং কাঁসাই কলিকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। কাঁসাই-এর শেষাংশের নাম **হলদী** নদী। কংসাবতীর উপনদী কুমারী পুরুলিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঁকুড়া জেলায় কংসাবতীতে মিশিয়াছে। সুবর্ণরেখা ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া মেদিনীপুর জেলার কতকাংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্তে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।


পশ্চিমের
মালভূমি
(পশ্চিমবঙ্গ)
০ ৬০
কি.মি.
নেপাল
ভুটান
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
তিস্তা নং
মালদহ
গঙ্গা নং বা পদ্মা নং
রামপুরহাট
সিউড়ী
আসানসোল
অজয় নং
বর্দ্ধমান
নদীয়া
বাঁকুড়া
দামোদর নং
পুরুলিয়া
রানাঘাট
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
২৪ পরগনা
সুবর্ণরেখা নং
ব ঙ্গো প সা গ র

জলবায়ু—পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। এই রাজ্যের পশ্চিমভাগ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রবল। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে তাপের পার্থক্য বেশী এবং বৃষ্টিপাত কম। গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা ৪০°—৪৫° সে. শীতের গড় তাপমাত্রা ২০°—২২° সে.। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০—১৫০ সে-মি.।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিম ভাগে বনভূমি আছে। এই সকল বনে **শাল, মহুয়া, পলাশ, বকুল, বাব্‌লা, শিমুল, কুসুম, কুল** প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মে। এই সকল বন্যবৃক্ষের শিকড় মাটি আটকাইয়া রাখে বলিয়া ভূমির ক্ষয় নিবারিত হয়। পলাশ, কুল প্রভৃতি গাছে **লাক্ষা-কীটের** চাষ হয়। লাক্ষাকীটের দেহ হইতে এক প্রকার আঠার মত রস বাহির হয়। উহা দ্বারা গালা তৈয়ারি হয়।

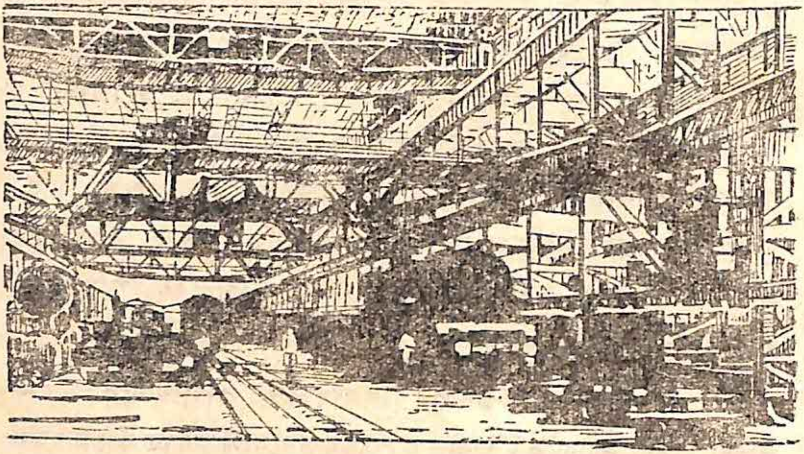
জলসেচ—বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম বলিয়া তথায় **জলসেচের** সাহায্যে চাষ-আবাদ চলে। **দামোদর ও ময়ূরাক্ষী** নদীতে সেচবাঁধ দিয়া বর্ধমান ও বীরভূম জেলার চাষের জমিতে জল সরবরাহ করা হয় এবং **বিদ্যুৎশক্তি** উৎপাদন করিয়া কলকারখানা ও অন্যান্য কাজের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বাঁকুড়ায় **কংসাবতীতে** বাঁধ দিয়া চাষের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার চাষের জমিতে জলসেচের সুবিধা হইবে।

কৃষিজাত দ্রব্য—মালভূমি অঞ্চলে ধান প্রধান কৃষিজাত ফসল। ইহা ব্যতীত, এই অঞ্চলে **গম, সরিষা, তিল, তিসি, তামাক, ইক্ষু, আলু, তুলা, কলাই** প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় রেশমকীটের খাদ্য হিসাবে তুঁত গাছের চাষ হয়।

খনিজ সম্পদ—বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে রানীগঞ্জে ও আসানসোলে দুই শতাধিক উৎকৃষ্ট কয়লার খনি আছে। ভারতের ⅓ ভাগ কয়লা পশ্চিমবঙ্গে উত্তোলিত হয়। কয়লা সম্পদ এই রাজ্যের শিল্পসমূহের উন্নতির প্রধান কারণ। বার্নপুরে ও বরাকরে **লৌহ**, পুরুলিয়ায় ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে **ফায়ার ক্লে**, **চুনাপাথর** ও **কেওলিন**, বাঁকুড়া জেলায় **উলফ্রাম** ও **কোয়ার্টজ**, পুরুলিয়া জেলার সীমান্তে **গ্রাফাইট**, **ডলোমাইট** ও **সিলিমেনাইট** পাওয়া যায়। চুনাপাথর সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কেওলিন হইতে চীনামাটির জিনিস তৈয়ারি হয়, ডলোমাইট ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়, 'ফায়ার ক্লে' দ্বারা তাপসহ ইট তৈয়ারি হয়।

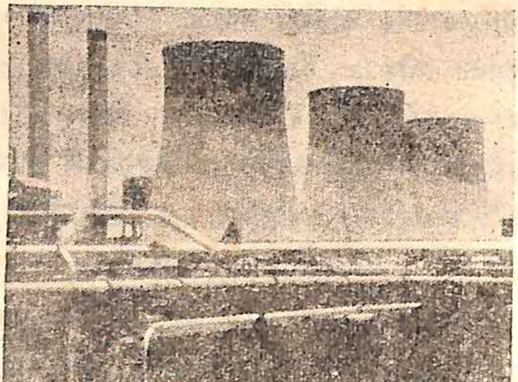
শিল্প—আসানসোল-দুর্গাপুর **শিল্পাঞ্চলটি** কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়লা ও শিল্পের উপযোগী অন্যান্য কাঁচামালের সহজ লভ্যতা, জলবিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুৎ পাইবার সুবিধা, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, জলপথে ও রেলপথে যাতায়াতের সুব্যবস্থা, প্রচুর জল, শ্রমিক, বাজার ও মূলধন ইত্যাদির সুবিধা থাকিবার ফলে এই অঞ্চলে বৃহদায়তন শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের **লৌহ** ও **ইস্পাত-শিল্প**, চিত্তরঞ্জনের **রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প** ও দুর্গাপুরের **ইস্পাত-শিল্প** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলার কুলটী, বার্নপুর ও হীরাপুর—এই তিনটি স্থানের ইস্পাত প্রকল্পের মিলিত নাম 'ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী' (I. I. S. Co.)। রানীগঞ্জের কয়লা, উড়িষ্যার লৌহ, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আনিয়া এই শিল্পে ব্যবহার করা হয়। আসানসোলের নিকটে চিত্তরঞ্জনে **রেল-ইঞ্জিন** নির্মাণের বিরাট কারখানা আছে। এই কারখানায় বছরে ৩০০টি ইঞ্জিন তৈয়ারি করিবার মত ব্যবস্থা আছে। দুর্গাপুরে ব্রিটিশ ও ভারত সরকারের সহযোগিতায়

একটি বিরাট ইস্পাত শিল্পের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে নানারকম যন্ত্রপাতি তৈয়ারি হয়।



চিত্তরঞ্জন কারখানা

দুর্গাপুরে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও কোক তৈয়ারির চুল্লী



দুর্গাপুরের কোক চুল্লী

আছে। কোক কয়লার ধোঁয়া হইতে গ্যাস, আলকাতরা, স্যাকারিন প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে লেন্স তৈয়ারির ও সার উৎপাদনের কারখানা আছে। দামোদর নদের তীরে দুর্গাপুরে এত অধিক সংখ্যক শিল্প সমাবেশ হওয়ায় ইহাকে পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় (Ruhr) অঞ্চলের সহিত তুলনা করা হয়। এতদ্ভিন্ন, আসানসোলের নিকট সাইকেল ও এ্যালুমিনিয়ম কারখানা, রূপনারায়ণপুরে বৈদ্যুতিক তার তৈয়ারির কারখানা, রানীগঞ্জে কাগজের কল, বার্নপুরে টালি, প্পাইপ প্রভৃতি মাটির জিনিস তৈয়ারির কারখানা, বীরভূম জেলার আহমদপুরে চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে আছে রেলগাড়ি ও ইঞ্জিন মেরামতের কারখানা। এই জেলায় হাঁস-মুরগী পালনকেন্দ্র আছে।



সাঁওতালদিহি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের কুটীর শিল্পের মধ্যে বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও বীরভূমের রেশম-শিল্প, পুরুলিয়ার গালা শিল্প ও বার্ণিশ তৈয়ারির শিল্প, শ্রীনিকেতনের (বীরভূম) বেতের মোড়া, ঝুড়ি, নানারকম হস্ত-শিল্পের কার্য, মেদিনীপুরের মাদুর শিল্প উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালদিহিতে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় পুরুলিয়া জেলার অর্থনীতির দ্রুত



লোধা পরিবার

উন্নতি সাধন হইবে। ভবিষ্যতে এই জেলায় নানারকম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

জীবজন্তু—পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশের বনভূমিতে চিতা ও নেকড়ে বাঘ, হনুমান ও বানর দেখা যায়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষি ও শিল্পকার্যে নিযুক্ত, অবশিষ্ট লোকেরা চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থ উপার্জন করে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমভাগে **সাঁওতাল, লোধা, ওরাওঁ, মুণ্ডা, বীরহোড়** প্রভৃতি কিছু-সংখ্যক উপজাতির লোক বাস করে।

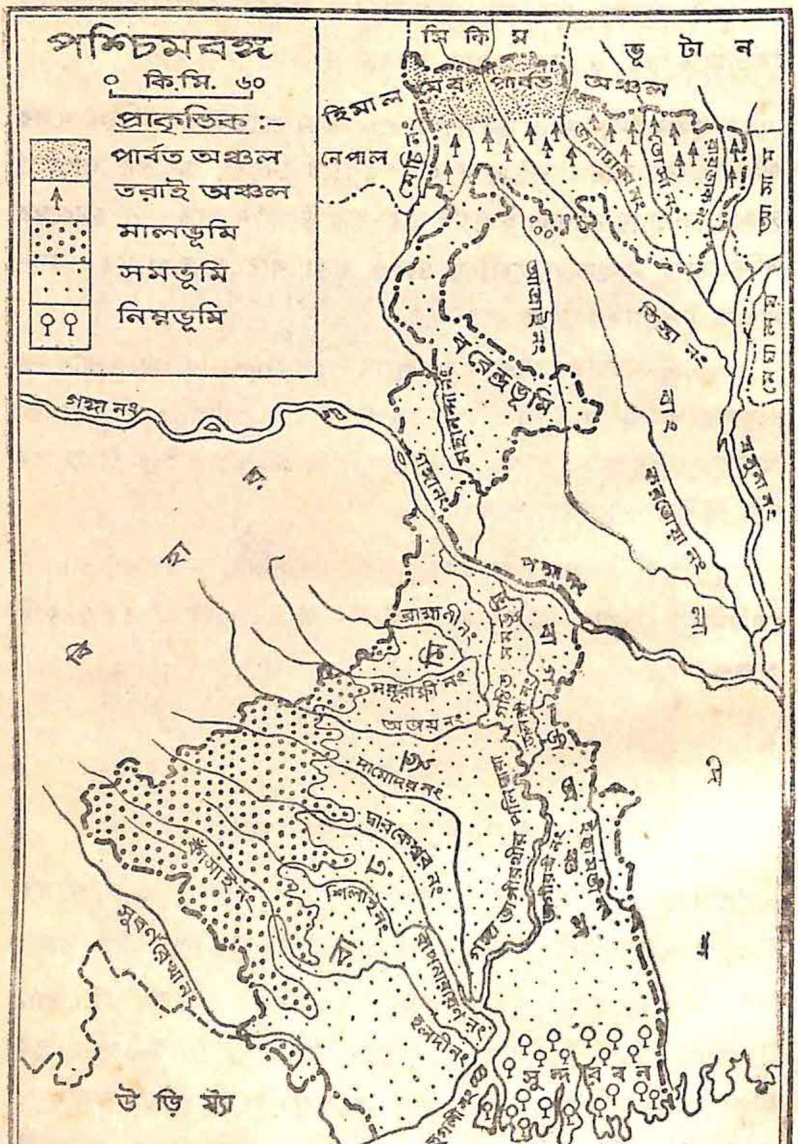
নগর—বীরভূম জেলায় **বোলপুর** রেল স্টেশনের অদূরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত **শান্তিনিকেতন** ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত **বিশ্বভারতী** অবস্থিত। বাঁকুড়া জেলার **জয়রামবাটী** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মস্থান।

পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় গালা তৈয়ারির কারখানা আছে। **মেদিনীপুর** জেলার **ঝাড়গ্রাম** স্বাস্থ্যকর স্থান; এখানে একটি কৃষি কলেজ আছে।

তৃতীয় পাঠ

উত্তর ও দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চল

প্রাকৃতিক বিবরণ—উত্তরের পার্বত অঞ্চল ও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ভূমিই নদীবাহিত পলির দ্বারা গঠিত **সমভূমি**। ইহাকে নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমি বলা হয় (Lower Ganges Plain)। গঙ্গানদী (পদ্মা) এই বিরাট সমভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। গঙ্গানদীর উত্তরে কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ **প্রাচীন পলি** দ্বারা গঠিত সমভূমি। স্থানে স্থানে পলিমাটি ৩০৫ মিটারের অধিক গভীর। ইহা **বরেন্দ্রভূমি** (Barind Tract)


পশ্চিমবঙ্গ
০ কি.মি. ৬০
প্রাকৃতিক :-
পার্বত অঞ্চল
তরাই অঞ্চল
মালভূমি
সমভূমি
নিম্নভূমি
নেপাল
ভূ টা ন
সুন্দরবন
উ ড়ি ষ্যা
ব ঙ্গো প সা গ র

নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী এবং বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুরের পূর্বাংশ দক্ষিণের সমতল ভূমির অন্তর্গত। গঙ্গা-ভাগীরথী নদী বাহিত **নবীন পলিমাটি** দ্বারা এই সমভূমি গঠিত। ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমাংশে মালভূমি অঞ্চলের পূর্বে যে সমতল ভূমি অবস্থিত উহাকে বলা হয় **রাঢ়ভূমি** (Rarh Plain)। ইহার অনেকাংশে বালিস্তর দেখা যায়। ভাগীরথী-হুগলীর পূর্বদিকের সমতল ভূমিকে বলা হয় **বাগড়ী** (Bagri)। মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ, নদীয়া, ২৪-পরগনা ও কলিকাতা ইহার অন্তর্গত।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধূলিয়ানের নিকট **গঙ্গা** দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। মূল স্রোত পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং অপর স্রোতটি **ভাগীরথী** নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণাংশের নাম **হুগলী**। গঙ্গা দীর্ঘকাল ধরিয়া পলি সঞ্চয় করিয়া নূতন ভূ-ভাগ বা ব-দ্বীপ গঠন করিয়াছে। পলি সঞ্চয়ের ফলে ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশের আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। **দামোদর, রূপনারায়ণ** ও **কাঁসাই** পশ্চিমাংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলীর সহিত এবং **ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী** ও **অজয়** ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তরাংশে মালদহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত **মহানন্দা** গঙ্গার (পদ্মার) উপনদী। **তোর্সা, জলঢাকা, তিস্তা** প্রভৃতি নদী কুচবিহারের এবং **আত্রাই** (সামান্য অংশ) পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাংলাদেশের যমুনা নদীতে পড়িয়াছে।

পদ্মার শাখানদী জলঙ্গী নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। ইছামতী, কালিন্দী, পিয়ালী, মাতলা, বিদ্যাধরী, গোসাবা, রায়মঙ্গল প্রভৃতি নদী ২৪ পরগনা জেলার উপর দিয়া

ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদীগুলি মৃতপ্রায় বর্তমানে এই নদীগুলির সংস্কার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গঙ্গানদীর মূল স্রোত পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যাইতেছে বলিয়া ভাগীরথীর স্রোতের বেগ কমিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ভাগীরথী ও হুগলীর নদীগর্ভে পলি সঞ্চিত হইয়া চর পড়িতেছে। তাহাতে কলিকাতা বন্দরে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল দুঃসাধ্য হইয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকট গঙ্গাবক্ষে **ফরাক্কা বাঁধ** তৈয়ারি হইয়াছে। এই প্রকল্প কার্যকরী হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভাগীরথী-হুগলীতে জলবৃদ্ধি পাইবে; কলিকাতা বন্দরের উন্নতি হইবে এবং মৃতপ্রায় নদীগুলি জলপূর্ণ হইয়া সজীব হইবে।

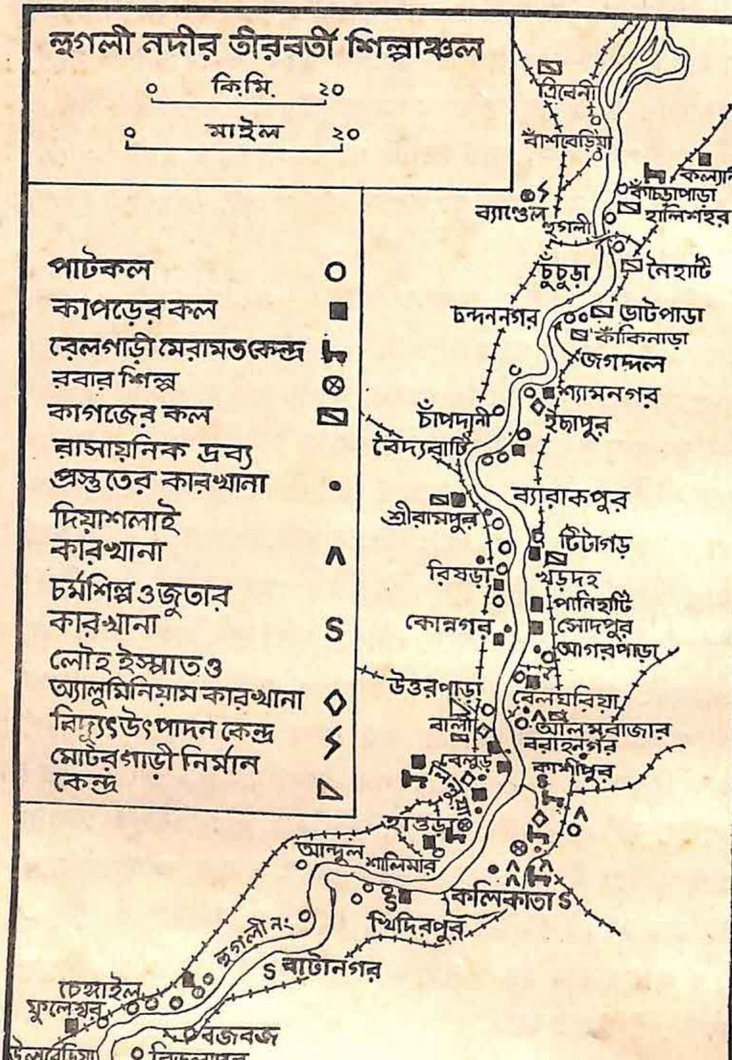
জলবায়ু—সমতলভূমির জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ইহার দক্ষিণাংশ সমুদ্রের নিকটবর্তী, উত্তরাংশ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই তীব্র। সমতলভূমিতে গ্রীষ্মের গড় উষ্ণতা ৩৫° সে., শীতের গড় উষ্ণতা ১৮° সে.। গ্রীষ্মের আর্দ্র **মৌসুমী** বায়ু হিমালয়ের গাত্রে বাধা পাইয়া পার্বত অঞ্চলে প্রচুর বারিবর্ষণ করে। দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। উত্তরাংশে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে ২০০ সেন্টিমিটার, কলিকাতায় ১৬০ সে-মি., বর্ধমানে ১৪০ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বিকাল বেলায় ঝোড়ো হাওয়া বহে, তাহাকে কালবৈশাখী বলে। আশ্বিনমাসে **আশ্বিনের ঝড়** বহে।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—সমতলভূমিতে বনভূমি নাই। কিন্তু অনেকস্থানে আম, কাঁঠাল, লিচু, অশ্বত্থ, বট, ছাতিম, শিমুল, বাঁশ, তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর, কলা ইত্যাদি গাছ প্রচুর জন্মে। কুচবিহারে লাল শিমুল গাছ বেশী জন্মে। অশ্বত্থ, বট, বাঁশ, শিমুল প্রভৃতি **পর্ণমোচী বৃক্ষ**।

কৃষিজাত দ্রব্য—সমতলভূমির পলিমাটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—**বেলেমাটি, এঁটেল মাটি ও দোআঁশ মাটি।** গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সমতলভূমির প্রায় সর্বত্রই বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া সেই সময় **ধান, পাট** ইত্যাদি **খারিফ** শস্যের চাষ হইয়া থাকে। শীতকালে স্বল্প বারিবর্ষণ হয়, তখন গম, কলাই, তৈলবীজ ইত্যাদি **রবিশস্যের** চাষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য **ধান**। এঁটেল মাটি ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধান জন্মে। ধানের পর পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ-যোগ্য কৃষিজ দ্রব্য **পাট**। ইহাও এঁটেল মাটিতে ভাল জন্মে। আর্দ্র জলবায়ু, মাঝারি ধরনের উত্তাপ পাট চাষের পক্ষে অনুকূল। ভাগীরথী বা হুগলী নদীর উভয় তীরে, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিহারে পাট উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে পাট জাতীয় তন্তু **মেস্তার** চাষও হয়। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও নদীয়া জেলায় **তৈলবীজের** চাষ বেশী হয়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, মালদহ, কুচবিহার ও মেদিনীপুর জেলার দোআঁশ মাটিতে **ইক্ষুর** চাষ হয়। মেদিনীপুর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে **গমের** চাষ হয়। কুচবিহার, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের বেলে-মাটিতে **আলুর** চাষ হয়। কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও নদীয়ায় **তামাক** বেশী উৎপন্ন হয়।

শিল্প—পাট-শিল্প পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিল্প। পৃথিবীতে পাট-শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র কলিকাতা শিল্পাঞ্চল। এই অঞ্চল হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে উত্তরে ত্রিবেণী হইতে দক্ষিণে উলুবেড়িয়া


হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল
০ কি.মি. ২০
০ মাইল ২০
পাটকল
কাপড়ের কল
রেলগাড়ী মেরামতকেন্দ্র
রবার শিল্প
কাগজের কল
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা
দিয়াশলাই কারখানা
চর্মশিল্প ও জুতার কারখানা
লৌহ ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম কারখানা
বিদ্যুৎউৎপাদন কেন্দ্র
মোটরগাড়ী নির্মান কেন্দ্র
ত্রিবেনী
বাঁশবেড়িয়া
কল্যানী
কাঁচড়াপাড়া
হালিশহর
ব্যাণ্ডেল
হুগলী
চুচুড়া
নৈহাটি
চন্দননগর
ভাটপাড়া
কাঁকিনাড়া
জগদ্দল
শ্যামনগর
চাঁপদানী
ইছাপুর
বৈদ্যবাটি
ব্যারাকপুর
শ্রীরামপুর
টিটাগড়
রিষড়া
খড়দহ
পানিহাটি
কোন্নগর
সোদপুর
আগরপাড়া
উত্তরপাড়া
বেলঘরিয়া
বালী
আলমবাজার
বরাহনগর
বেলুড়
কাশীপুর
হাওড়া
আন্দুল
শালিমার
কলিকাতা
খিদিরপুর
হুগলী নং
বাটানগর
চেঙ্গাইল
ফুলেশ্বর
বজবজ
উলুবেড়িয়া
বিড়লাপুর

এবং পূর্বতীরে উত্তরে কাঁচড়াপাড়া হইতে দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটের কলের সংখ্যা ১০১। রানীগঞ্জের কয়লা, দামোদর পরিকল্পনার বিদ্যুৎ সরবরাহ ও কলিকাতা বন্দরের সহিত যোগাযোগ প্রভৃতি এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়ক। পাট হইতে ক্যানভাস ব্যাগ, ত্রিপল, কার্পেট, দড়ি, পা-পোষ, ঢাকনার কাপড় ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈয়ারি হয়। পাটের সঙ্গে মেস্তা মিশাইয়া পাটের অভাব পূরণ করা হয়। বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিবার জন্য পাটজাত দ্রব্যের অধিকাংশই রপ্তানি করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে তূলা খুব সামান্যই উৎপন্ন হয়। তৎসত্ত্বেও এই রাজ্যে **কার্পাস বস্ত্র বয়ন-শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। সমতলভূমি অঞ্চলে ৪০টিরও অধিক কাপড়ের কল আছে। এই কলগুলি হুগলী নদীর উভয় তীরে—শ্রীরামপুর, হাওড়া রিষড়া, কোন্নগর, বেলঘরিয়া, সোদপুর, পানিহাটী, শ্যামনগর, সালকিয়া, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। রাণীগঞ্জের কয়লা, পশ্চিমবঙ্গের আর্দ্র জলবায়ু, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, যাতায়াতের সুব্যবস্থা ইত্যাদি কারণ বস্ত্র শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে। শান্তিপুর, ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ **তাঁত-শিল্পের** জন্য বিখ্যাত।

কাগজ-শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ উন্নত। নৈহাটী, কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, আলমবাজার, বালী, শ্রীরামপুর, ত্রিবেণীতে কাগজের কলগুলি অবস্থিত। হুগলী জেলায় উত্তরপাড়ার নিকট 'হিন্দ্‌মোটর' নামক স্থানে 'হিন্দুস্থান মোটরস্' নামক **মোটর গাড়ী নির্মাণের** বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে বজবজের নিকট বাটানগরে **চর্ম-শিল্পের** একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। জুতা নির্মাণের কেন্দ্র হিসাবে ইহা বিখ্যাত। হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়ায় সাহাপুরে

ডান্‌লপ্ কোম্পানীর বিরাট **রবার** কারখানা অবস্থিত। এখানে মোটর-গাড়ী ও লরীর টায়ার প্রস্তুত হয়। দক্ষিণেশ্বরে উইমকো নামক একটি **দিয়াশলাই** তৈয়ারির কারখানা আছে। কাশীপুরে সরকারী **বন্দুক** ও **গোলা** তৈয়ারি করিবার কারখানা আছে। হুগলী জেলায় রিষড়া নামক স্থানে এ্যাল্‌ক্যালি কেমিক্যাল কর্পোরেশনের এক বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের **রাসায়নিক দ্রব্য** ও ঔষধের কারখানা উল্লেখযোগ্য।

হাওড়া জেলার লিলুয়াতে এবং ২৪ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ায় রেলের প্রয়োজনীয় নানাবিধ অংশ তৈয়ারি ও মেরামত করা হয়। বেলুড়ে একটি **এ্যালুমিনিয়ম** কারখানা আছে। খিদিরপুরে (কলিকাতা) নেতাজী সুভাষ ডকে (পূর্বনাম কিং জর্জ ডক্) একটি জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে। এতদ্ব্যতীত, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় ও নদীয়া জেলার পলাশীতে **ইক্ষু-শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীয়া জেলার হরিণঘাটাতে একটি **দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান** সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের **মৃৎশিল্প** উল্লেখযোগ্য। কাচ ও মৃৎশিল্পের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উৎকৃষ্ট **রেশম বস্ত্রাদি** প্রস্তুত হয়। বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের **কাঁসা** ও **পিতলের** বাসন, মুর্শিদাবাদের **হাতীর দাঁতের** জিনিস, কুচবিহারের **তাঁত-শিল্প** ও **কাষ্ঠ-শিল্প** উল্লেখযোগ্য।

জীবজন্তু—সমতলভূমির অন্তর্গত জেলাগুলিতে বনভূমি নাই। মাঝে মাঝে গাছপালায় বানর এবং ঝোপ-ঝাড়ে শৃগাল, সরীসৃপ ইত্যাদি জীবজন্তু দেখা যায়। ইহা ব্যতীত, প্রায় সর্বত্র গো, মহিষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু দেখা যায়। নানাজাতের পাখী কুচবিহারে দেখা যায়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—সমভূমির অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিকার্য ও শিল্পকার্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামাঞ্চলে নানারকম কুটীর শিল্পের কাজে অনেকে নিযুক্ত আছে। তন্তুবায় বা তাঁতী, কর্মকার বা কামার, সূত্রধর বা ছুতার, জেলে, গোয়ালা প্রভৃতি স্ব স্ব জাতিগত পেশার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। শহরের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত ও চাকরিজীবী। কেহ বা ওকালতি, ডাক্তারী ইত্যাদি স্বাধীন ব্যবসায়ী, কেহ কেহ নানারকম ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে। কুচবিহারে কোচ উপজাতির লোকেরা বাস করে, তাহারা প্রধানত কৃষিজীবী। ইহা ভিন্ন, গারো, ওরাওঁ, সাঁওতাল, মেচ প্রভৃতি উপজাতির কিছুসংখ্যক লোকও কুচবিহারে বাস করে। গারো ও মেচ নারীরা নানা রঙের তাঁতবস্ত্র-বয়ন করিতে সক্ষম।

নগর—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী **কলিকাতা** (উপকণ্ঠাদিসহ জনসংখ্যা ৭০·৪০ লক্ষ) সমুদ্র হইতে ১২৮ কি-মি. অভ্যন্তরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ও দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর এবং পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। কলিকাতার উপকণ্ঠে **দমদম** আন্তর্জাতিক বিমানপথের একটি প্রসিদ্ধ স্টেশন। ফোর্ট উইলিয়ম, রাজভবন, যাদুঘর, তেরতলা সরকারী দপ্তরখানা, হাইকোর্ট, সংসদ ভবন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ ইত্যাদি অনেক দ্রষ্টব্য স্থান কলিকাতায় আছে।

হুগলী জেলার **কামারপুকুর** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান। হাওড়া জেলার **শিবপুরে** বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। মেদিনীপুর জেলার **বীরসিংহ** গ্রাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান। **ঘাটাল** পিতল ও কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত। মেদিনীপুর জেলার **তমলুক** প্রাচীনকালে একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল, তখন ইহার নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। **বর্ধমান** জেলার প্রধান শহর। **কাঞ্চননগরের**

ছুরি-কাঁচি বিখ্যাত। **কৃষ্ণনগর** নদীয়া জেলার প্রধান শহর। এখানকার মৃৎশিল্প বিখ্যাত। **নবদ্বীপ** শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশে **কল্যাণী** নামে একটি উপনগরী স্থাপিত হইয়াছে। এখানে সুতাকল, যক্ষ্মা-হাসপাতাল, পশুপালন কেন্দ্র ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **মুর্শিদাবাদ** প্রাচীন শহর। এখানে হাজার দুয়ারী নামে নবাবদের বিরাট প্রাসাদ আছে। মালদহ জেলার প্রধান শহর **ইংরাজবাজার**। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রধান শহর **রায়গঞ্জ**। ইহা পাট ও তামাকের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। **কুচবিহার** জেলার প্রধান শহর। এখানকার মহারাজার প্রাসাদ, মদনমোহনের মন্দির ও ভিক্টোরিয়া কলেজ দেখিবার জিনিস।

চতুর্থ পাঠ

সুন্দরবন ও মেদিনীপুর জেলার উপকূলের বালিয়াড়ি অঞ্চল

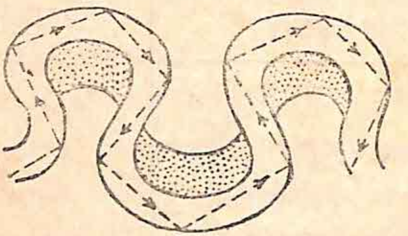
প্রাকৃতিক বিবরণ—২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে ব-দ্বীপ অঞ্চলের নিম্নভূমিতে আছে অরণ্যময় জলাভূমি; ইহার নাম **সুন্দরবন**। নদীর নিম্ন প্রবাহে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ, পলি, বালি প্রভৃতি জমিয়া মোহানায় মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের ন্যায় ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে। ইহাকে **ব-দ্বীপ** বলে। এই ভূখণ্ডের উপর দিয়া নদীর স্রোত নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া বহিয়া যায়। গঙ্গার দক্ষিণে বিশাল ব-দ্বীপই প্রকৃত ব-দ্বীপ (Delta proper)। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপের পশ্চিমাংশ মাত্র পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। এই ব-দ্বীপকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ** (Moribund Delta)—মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা ইহার অন্তর্গত। জলঙ্গী, চূর্ণী, ভৈরব প্রভৃতি নদী গঙ্গা বা পদ্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়

ইহাদের মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত হইতে পারে না। পলিতে নদীখাত ভরাট হওয়ায় উহারা মজিয়া গিয়াছে। (২) পলিমাটি দ্বারা আবৃত প্রবীণ ব-দ্বীপ (Mature Delta); বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের



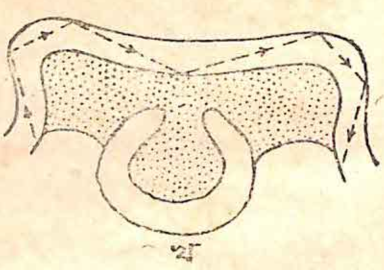
পূর্বাংশ এবং হাওড়া ও হুগলী জেলার সর্বাংশ এই ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। (৩) প্রাণবন্ত বা সজীব ব-দ্বীপ (Active Delta)—২৪ পরগনা জেলার উত্তরাংশ এবং দক্ষিণাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। উত্তরাংশে **বিদ্যাধরী, পিয়ালী** প্রভৃতি নদী শুষ্ক ও মৃতপ্রায়। দক্ষিণাংশে সুন্দরবনে অসংখ্য খাঁড়ি ও ছোটবড় দ্বীপ আছে। সাগর দ্বীপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

ফ্রেজারগঞ্জ অপর একটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ। ইহা ব্যতীত, দক্ষিণাংশে আছে লোনা জলের বহু উপহ্রদ, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও স্বাভাবিক বাঁধ। নদীর গতিপথে পলিমাটি ও বালির চর থাকিলে নদী সাধারণত আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে (চিত্র ক)। এইরূপে নদী বাঁকা পথে চলিতে



ক

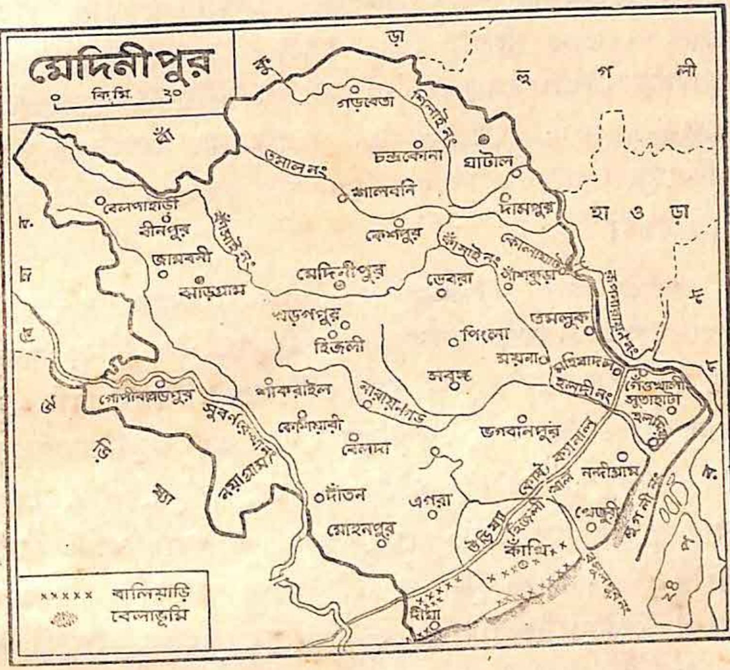
চলিতে ইহার বাঁক বড় হয় এবং নদী ক্রমে সোজা পথে চলিতে চেষ্টা করে। ইহাতে নদীর নূতন গতিপথ হইতে বিচ্ছিন্ন বাঁক অশ্বের ক্ষুরের মতো হয় বলিয়া উহাকে **অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ** (Horse-shoe Lake) বলে (চিত্র খ)। এই প্রকার বিচ্ছিন্ন খাতকে বিল (Bil) বলা হয়। প্লাবনের জল কমিয়া গেলে নদীর দুই তীরে পলি, কাঁকর, বালি ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া **স্বাভাবিক বাঁধ** (Levee) এবং নদীর তলদেশে পলি সঞ্চিত হইয়া খাতের সমতল উঁচু হইয়া **প্লাবন সমভূমির** (Flood Plain) সৃষ্টি করে। দক্ষিণাংশে **হুগলী, মাতলা, গোসাবা, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল** প্রভৃতি নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।



খ

মেদিনীপুর জেলার মহকুমা কাঁথির দক্ষিণ-পূর্বাংশ সমুদ্রোপকূলের বালিয়াড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত। বঙ্গোপসাগরের তীরের সংলগ্ন নিম্নভূমি প্রায়ই লোনাজল-মগ্ন থাকে। কাঁথির সমুদ্রোপকূল অভগ্ন, এখানে কোন দ্বীপ নাই, কিন্তু অনেক **বালিয়াড়ি** (Sand Dune) আছে।

কখনো কখনো বায়ুপ্রবাহে বালুকারাশি সমুদ্রতটে সৈকতের উপরে সঞ্চিত হইয়া বালিয়াড়ির বাঁধের সৃষ্টি করে। উপকূলে বালি, পলি ও



লবণ মিশ্রিত মৃত্তিকা দেখা যায়। তমলুক মহকুমার দক্ষিণ-পূর্বের সামান্য অংশ এই নিম্ন উপকূলের ভূমির সংলগ্ন। হলদী নদী এখানে হুগলী নদীর সহিত মিশিয়াছে।

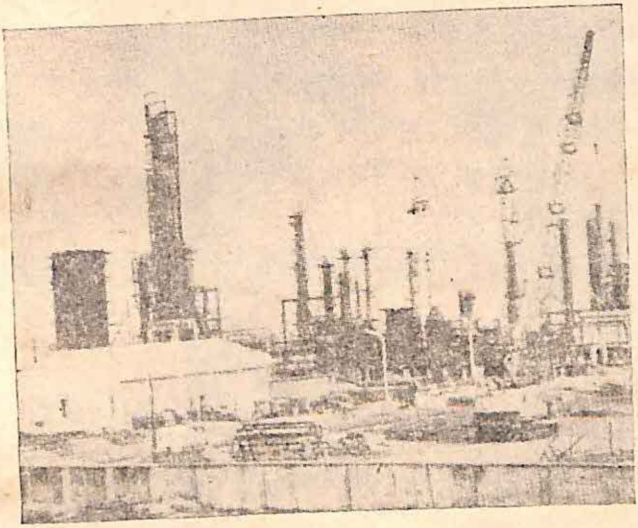
জলবায়ু—সমুদ্র নিকটে থাকিবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের তারতম্য ৯।১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী হয় না। সাগরদ্বীপে গ্রীষ্মকালে গড় তাপ ২৮° সে., শীতকালে গড় তাপ ২০° সে.। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রের উপকূলের এবং ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ।

শীতকালে বায়ু কিছু শুষ্ক থাকে, কিন্তু শীতকাল অল্পস্থায়ী। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে নিম্ন উপকূলে বৃষ্টিপাত হয় জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। জুলাই-আগষ্ট মাসে বৃষ্টির পরিমাণ বেশী। সুন্দরবন অঞ্চলে গড়ে ২০৪ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী এবং আশ্বিনমাসে আশ্বিনে-ঝড় হয়। গ্রীষ্মকালে মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলে গড়ে ২০০ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের (Cyclonic Depression) সৃষ্টি হয় এবং উহাতে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—২৪-পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে সমুদ্রোপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ সুন্দরবনের জলাভূমিতে এক নিবিড় অরণ্য আছে। এই বনে **সুন্দরী** বৃক্ষই বেশী জন্মে। সুন্দরী কাঠ গাঢ় লাল, শক্ত ও মূল্যবান। সুন্দরী বৃক্ষ ব্যতীত এই বনভূমিতে গরাণ, গর্জন, শিমুল, গেঁউয়া, জারুল, ছাতিম, পিটুলী, বাঁশ, বেত, কেয়া প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মে। **গর্জন** ও **গরাণ** কাঠও যথেষ্ট দামী। গরাণ কাঠের খুঁটি এবং এই গাছের বাকল-ভিজানো জলে চামড়া কষানো (tanning) হয়। শিমুল, গেঁউয়া, পিটুলী ও ছাতিম কাঠে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও প্যাকিং বাক্স তৈয়ারি হয়। সুন্দরবনের কাঠের দ্বারা নৌকা, লাঙ্গল, গরুর-গাড়ীর চাকা তৈয়ারি হয়। নানারকম কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত, এই বনে প্রচুর গোলপাতা ও হোগলা জন্মে। এইগুলি এই অঞ্চলের লোকদের ঘরের ছাউনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে নারিকেল, সুপারি গাছও জন্মে। সুন্দরবন হইতে প্রচুর পরিমাণে মোম ও মধু সংগ্রহ করা হয়। এই অরণ্য হইতে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয় বলিয়া ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ বলা যায়। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকূলের লোনা মাটিতে নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর প্রভৃতি

পামজাতীয় বৃক্ষ জন্মে। মেদিনীপুর ও সুন্দরবনের লোনা মাটি ও জলবায়ু নারিকেল চাষের উপযোগী। নারিকেল চাষ বৃদ্ধি পাইলে এখানে ভবিষ্যতে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বাঁধের সাহায্যে লোনা-জল আটক করিয়া কিছু ধানের চাষ হইতেছে। তূলার চাষও আরম্ভ হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় সমুদ্রজল হইতে লবণ উৎপাদন



হলদিয়ার নির্মীয়মাণ তৈল শোধনাগার

করা হয়। সরকারী উদ্যোগে হলদী নদীর তীরে অবস্থিত নব নির্মিত হলদিয়া বন্দরে একটি খনিজ তৈল শোধনাগার স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে হলদিয়ায় একটি সুপরিকল্পিত নগর গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। সমুদ্রোপকূলের নিকট খাঁড়িগুলিতে ইলিশ, ভেটকি, তপসে, গুর্জালি, চিংড়ি (Prawns), পম্‌ফ্রেট ইত্যাদি মাছ ধরিবার সুযোগ (Estuarine Fisheries) আছে। মেদিনীপুর

জেলার দীঘা হইতে জুনপুট পর্যন্ত এবং ২৪-পরগনা জেলার ডায়মণ্ড-হারবার, কুলপি, নামখানা, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য **মৎস্য শিকার কেন্দ্র**। সমুদ্র হইতে নানা জাতের প্রচুর মাছ ধরিয়া কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের বাজারে পাঠানো হয়।



দীঘার দৃশ্য

জীবজন্তু—সুন্দরবনে যে সকল জন্তু বাস করে তাহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রই সর্বাপেক্ষা হিংস্র ও ভয়ংকর। ইহাকে **রয়েল বেঙ্গল টাইগার** বলে। নিবিড় অরণ্যে চিতাবাঘ, নেকড়ে, শূকর, হরিণ, সজারু, বানর, সর্পাদি সরীসৃপ, গোসাপ ও জলাভূমিতে কুমীর দেখা যায়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—সজনেখালি, রাঙাবালি, গোসাবা, হাঁড়িভাঙা ইত্যাদি অঞ্চলে মনুষ্যবসতি আছে। হস্তশিল্প, নৌ-চালনা, পশু-শিকার, মধু ও মোম সংগ্রহ, চাষবাস এখানকার অধিবাসীদের উপজীবিকা। ভ্রমণকারীরা প্রতি বৎসর সুন্দরবন ও দীঘায় যাতায়াত করেন বলিয়া এই অঞ্চলে **পর্যটন শিল্প** গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

প্রসিদ্ধ স্থান—**ডায়মণ্ড হারবার** হুগলী নদীর মোহানার অনতিদূরে অবস্থিত বন্দর ; ইহা কলিকাতার সহিত মোটর ও রেলপথে সংযুক্ত। ইহা ২৪ পরগনা জেলার একটি মহকুমা। রাজ্যসরকার ভ্রমণকারীদের জন্য এখানে একটি ট্যুরিস্ট লজ্ নির্মাণ করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকূলে **দীঘা** একটি নূতন স্বাস্থ্য নিবাস।

তৃতীয় অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গ

সূচনা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সরকার সাধারণত উন্নয়ন **পরিকল্পনা** গ্রহণ করেন। কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদির উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা পরিকল্পনার লক্ষ্য। বস্তুত, পরিকল্পিত কর্মসূচী ব্যতীত উৎপাদন, বণ্টন, সংরক্ষণ উন্নয়ন ইত্যাদি কোনরূপ কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। সুতরাং নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া তাহার রূপায়ণই উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য।

কৃষি-ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা এখনও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। খরা বা বন্যার জন্য কৃষি-কার্য এখনও ব্যাহত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা এই রাজ্যে খাদ্য সমস্যার অন্যতম কারণ। সুতরাং খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য প্রথমে উন্নত ধরনের কৃষি-ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন এবং অন্যান্য যন্ত্রশিল্প ও কুটীর শিল্পের উন্নতির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-'৫৬) কৃষি, জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। দেশ বিভাগের একটি কুফল উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভব এবং অন্য একটি কুফল খাদ্য-সমস্যা। এইরূপ জটিল পরিস্থিতিতেই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কাজ শুরু হয় ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসূচী তৈয়ারি করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে ৮·৫২ কোটি টাকা, সেচ ও বিদ্যুৎ—১৫·৮০ কোটি টাকা, শিল্প—১·১৫ কোটি টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ—১৫·৫৪ কোটি টাকা, জনসেবা ও অন্যান্য—৩১·২৪ কোটি টাকা, মোট—৭২·২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০·৬ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়াছিলেন।

প্রথম পরিকল্পনায় সার ও ভাল বীজ সরবরাহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। **সেচ**-বিভাগে ৩১টি ও **বিদ্যুৎ** সরবরাহের ৯টি কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় কুটীর শিল্পের উন্নতির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। যোগাযোগের সুবিধার জন্য রাস্তা তৈয়ারি হয় ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা

হয়। এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে জল সরবরাহের জন্য সাত শতাধিক নলকূপ বসানো হইয়াছে। বসবাসের সুব্যবস্থার কাজে কল্যাণী উপনগরী তৈয়ারির কথা প্রথমেই উল্লেখ করা যায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬-'৬১) **শিল্পোন্নয়ন,** বেকার সমস্যার সমাধান, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ, শ্রমিক কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিবার সুযোগ সকলকে দিতে হইবে—এই আদর্শ ই দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল। প্রথম পরিকল্পনার কাজে জনসাধারণের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ হইতে তাহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে—৩৩·৩৬ কোটি টাকা, সেচ ও বিদ্যুৎ —৩০·৪০ কোটি টাকা, শিল্প—৯·৪৮ কোটি টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ—১৯·০৩ কোটি টাকা, সমাজ-সেবা ও অন্যান্য—৫৫·২০ কোটি টাকা, উন্নয়ন কর্পোরেশন—৬·১৭ কোটি টাকা, মোট—১৫৩·৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সমাজ সেবার ক্ষেত্রে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি নানা বিভাগে কাজ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের কয়লার উপর নির্ভর করিয়াই দুর্গাপুরে একটি **কোক-চুল্লী** স্থাপিত হইয়াছে। কোক-চুল্লীকে কেন্দ্র করিয়া দুর্গাপুরে নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কুটীর ও পল্লীশিল্পগুলি রাজ্য সরকারের এবং প্রধান শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় উন্নতি লাভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬১—'৬৬) মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতি সাধন, শিল্প-যন্ত্রপাতি নির্মাণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি সাধন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হওয়া। এই পরিকল্পনায় কৃষিকে

অগ্রাধিকার প্রদান করা হইলেও প্রয়োজনীয় শিল্প, শক্তি, পরিবহন ইত্যাদি সম্প্রসারণের ব্যবস্থার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়। অনুন্নত অঞ্চল-সমূহের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সমাজসেবা ইত্যাদির উপর সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় রাজ্যসরকারের ব্যয় হইয়াছিল ৩০০.৪৮ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনার (১৯৬৯—'৭৪) উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করণ, খাদ্যশস্য মূল্যের স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ, পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ, নূতন কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া বেকারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদি। জনসাধারণকে যথেষ্ট অর্থ নৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল লক্ষ্য। এই পরিকল্পনায় কয়েকটি প্রধান ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে এবং এইগুলির শাখা সম্প্রসারণ করিয়া পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনা একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী। এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হইয়াছিল ৩২২.৫০ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনায় পল্লী শিল্পোন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথেষ্ট ঘাটতি রহিয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কিরূপ অগ্রগতি হইয়াছে তাহা অতঃপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

প্রথম পাঠ

জলসেচ

আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষি ও শিল্পের দান অপরিসীম। সুতরাং কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য **জলসেচ** ও **বিদ্যুৎ** উৎপাদনের গুরুত্ব অত্যধিক। কৃষিকার্যের প্রধান উপাদান জল। পশ্চিমবঙ্গে চাষ-আবাদ প্রধানত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সকল সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না এবং বৃষ্টির পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। আবার কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও বা অতিবৃষ্টি হয়। বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত অনেক কম। এই সকল কারণে পশ্চিমবঙ্গের শুষ্ক অঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে **জলসেচের** কাজ চালানো হয়। অনেক জায়গায় কূপ বা গভীর **নলকূপের** সাহায্যে জলসেচের কাজ চলিতেছে। আবার কোন কোন জায়গায় **খালের জল** দ্বারা সেচের কাজ চলিতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প ও ৪০টি মাঝারি নিষ্কাশন খাল প্রকল্প (Drainage Scheme) গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমতা জল নিকাশ প্রকল্প, সোনারপুর-আরাপাঁচ জলনিকাশ প্রকল্প, বাগজোলা-ঘুনী-যাত্রাগাছি জলনিকাশ প্রকল্প, মালদহের মহানন্দা জল নিকাশ প্রকল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও অনেকগুলি **জলনিকাশ প্রকল্প** কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের দ্বারা ২,০০০ একর (৮০০ হেক্টেয়ার)* জমি এবং জলনিকাশ প্রকল্পের দ্বারা ১'৫ লক্ষ একর ('৬ লক্ষ হেক্টেয়ার) জমি উপকৃত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার **মেদিনীপুর খাল** ও **হিজলী খাল**, বর্ধমান জেলার **দামোদর খাল**, বর্ধমান ও হুগলী জেলার **ইডেন**

---

* ১ হেক্টেয়ার=২'৫ একর।

খাল, বীরভূম জেলার **বক্রেশ্বর খাল** এবং বাঁকুড়া জেলার **শালবাঁধ খাল** উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির তুলনায় এই সমস্ত খালের সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। পশ্চিমবঙ্গে চাষ-যোগ্য জমির পরিমাণ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ একর ('৫৫ লক্ষ হেক্টেয়ার), সেচের সুবিধা পায় মাত্র ১৮ লক্ষ একর (৭'২ লক্ষ হেক্টেয়ার) জমি। ১৯৭০—'৭১ খ্রীস্টাব্দে কূপ দ্বারা ১৭ হেক্টেয়ার, সরকারী ও বেসরকারী খাল দ্বারা যথাক্রমে ৭৬২ হেক্টেয়ার ও ৩৪৯ হেক্টেয়ার, জলাশয়ের দ্বারা ৩১২ হেক্টেয়ার এবং অন্যান্য উপায়ে ১৯২ হেক্টেয়ার, মোট ১,৬৩২ হেক্টেয়ার জমিতে সেচকার্য হইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ হইতে পর্যায়িত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে কয়েকটি নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। নদীর ধ্বংস ক্ষমতাকে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করাই নদী পরিকল্পনার মূখ্য উদ্দেশ্য। গঠনমূলক কার্যের মধ্যে নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিসংরক্ষণ, জলসেচ, জল-স্রোতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, খালে নৌ-চলাচল, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, মৎস্যের চাষবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি প্রধান। এইরূপ পরিকল্পনাকে **বহুমুখী নদী পরিকল্পনা** (Multipurpose River Project) বলা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব হইতেই ভারত সরকার **দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন** (ডি. ভি. সি.) নামক এক সংস্থা গঠন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে এই বহুমুখী পরিকল্পনার কাজ গ্রহণ করেন। দামোদর নদ ছোটনাগপুরের মালভূমির অন্তর্গত পালামৌ জেলার খামারপাত নামক পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া হাজারিবাগ ও মানভূম জেলার মধ্য দিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় প্রবেশ

করিয়াছে। বর্ধমান শহর পর্যন্ত পূর্বমুখী পরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া দামোদর কলিকাতার দক্ষিণে ফলতার বিপরীত দিকে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। বর্ষাকালে দামোদর ও ইহার উপনদীগুলিতে এত অধিক পরিমাণে জল হয় যে উহাতে বন্যার সৃষ্টি হয়। পূর্বে প্রতি বৎসরই এইরূপ বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ক্ষতি হইত। এই ধ্বংসাত্মক বন্যা নিবারণের জন্য দামোদর ও উহার উপনদী সমূহের উচ্চগতিতে



ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে বার্মো, আয়ার, কোনার (৩টি), পাঞ্চেৎ, বোকারো, মাইথন, তিলাইয়া ও বেলপাহাড়ীতে দশটি বাঁধ এবং বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে একটি সেচবাঁধ বা ব্যারেজ তৈয়ারি হইয়াছে। ব্যারেজের নিকট হইতে নদীর দুইপার্শ্বে খাল কাটিয়া

পরিবহন ও জলসেচ উভয়বিধ কার্য চলিতেছে। বোকারো, তুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরায় তিনটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কোনার, তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের দ্বারা বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় খারিফ মরসুমে ৮·৪৫ লক্ষ একর (৩·৩৮ লক্ষ হেক্টেয়ার) ও রবি মরসুমে ৫৫ হাজার একর (২২ হাজার হেক্টেয়ার) জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৭১-'৭২ খ্রীস্টাব্দে চতুর্থ পরিকল্পনা কালে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের দ্বারা ৮·৭২ লক্ষ একর (৩·৪৯ লক্ষ হেক্টেয়ার) জমিতে সেচ দেওয়া হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—ময়ূরাক্ষী বা মোর নদী বিহারের ছোট-নাগপুর মালভূমির সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দেওঘরের নিকট ত্রিকূট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সাঁওতাল পরগনা ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী নদীতে পড়িয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অনুযায়ী সাঁওতাল পরগনার তুমকার নিকট মাসাঞ্জোর নামক স্থানে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। কানাডা সরকারের সহায়তায় ইহা নির্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কানাডা বাঁধ বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকট তিলপাড়া নামক স্থানে একটি সেচবাঁধ বা ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় বক্রেশ্বর, কোপাই, দ্বারকা ও ব্রাহ্মণী নদীতে চারিটি ছোট ছোট ব্যারেজ নিমিত হইয়াছে। তিলপাড়া ব্যারেজের তুই দিকের খালের সাহায্যে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে প্রায় ২·৫০ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের দ্বারা ৪ মে-ও. জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হইতেছে।

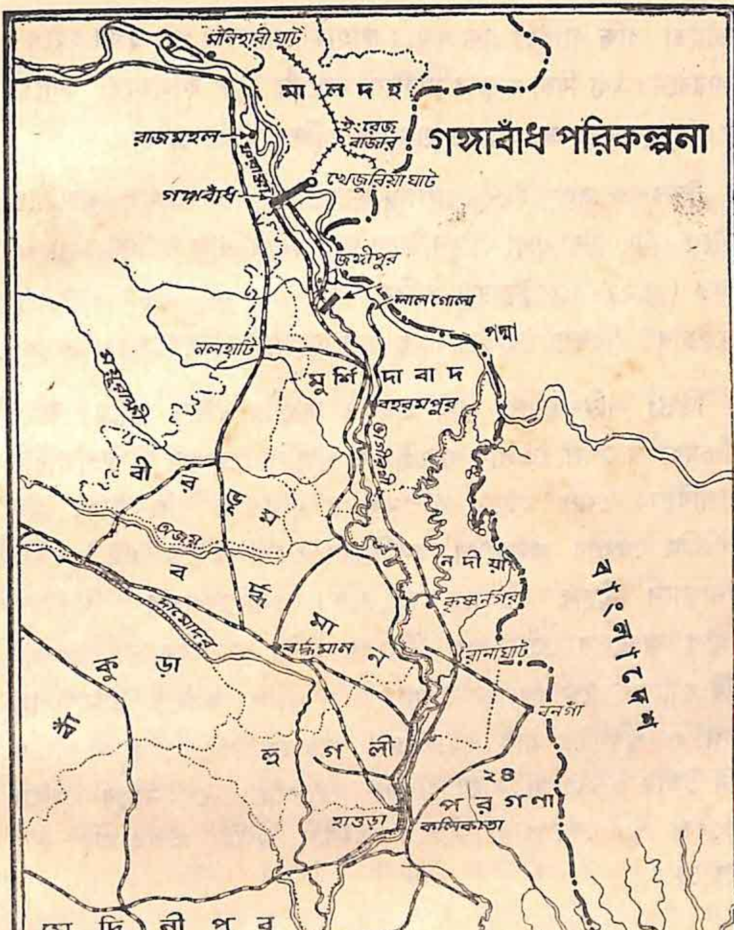
কংসাবতী পরিকল্পনা—কংসাবতী নদী পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম সীমান্তে ছোটনাগপুরের পার্বতভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলী নদীতে



পড়িয়াছে। এই পরিকল্পনার কাজ বাঁকুড়া জেলায় আরম্ভ হইয়াছে। এখানে কংসাবতীর উপনদী কুমারী নদীর উপর অম্বিকা নগর নামক স্থানে একটি বাঁধ এবং পুরুলিয়ায় সঙ্গমের নিকট অপর একটি বাঁধ নির্মিত হইতেছে। সেচ খাল কাটা হইয়াছে। বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হইলে এই প্রকল্পের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩'৮০ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের সুবিধা হইবে।

গঙ্গাবাঁধ বা ফরাক্কা পরিকল্পনা—গঙ্গার প্রধান স্রোত পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যাইতেছে বলিয়া গঙ্গার শাখানদী ভাগীরথী ক্রমশ মজিয়া যাইতেছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে ইহা গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ফলে ভাগীরথী স্রোতোহীন ও ক্ষীণতোয়া হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার তলদেশে পলি ও মাটি জমিতেছে। অজয়, দামোদর প্রভৃতি নদী বালি, কাদা, মাটি প্রভৃতি আনিয়া হুগলী নদীতে ভাগীরথীর দক্ষিণাংশে ফেলে। ইহাতে নদীতে মাঝে মাঝে চর পড়িয়া কলিকাতা বন্দরে জাহাজ আসিবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। ড্রেজার যন্ত্রে মাটি কাটিয়া পাইলট স্টীমারের সাহায্যে জাহাজকে কলিকাতা বন্দরে আনিতে হয়। জলের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় নদীর জলে লবণের অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং কলিকাতায় পানীয় জল লবণাক্ত হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভারত সরকার গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট **তিলডাঙ্গা** নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহাই **ফরাক্কা বাঁধ**। এই বাঁধের উপর দিয়া রেলপথে ও রাজপথে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের সহিত উত্তরাংশের সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বাঁধের পশ্চাদ্ভাগে (উত্তর-পশ্চিমে) গঙ্গা হইতে ৩৮'৪০ কি-মি. দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়া জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত করা হইতেছে। ফলে ভাগীরথী-হুগলী নদীতে পুনরায় জলবৃদ্ধি পাইবে এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় জলসেচের পক্ষে সুবিধা হইবে। পদ্মার শাখানদী জলঙ্গী ও চূর্ণী নদীতেও প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা দ্রুত কার্যকরী হইলে কলিকাতা বন্দরের


গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা
মনিহারী ঘাট
মা ল দ হ
ইংরেজ বাজার
রাজমহল
খেজুরিয়া ঘাট
গঙ্গাবাঁধ
জঙ্গীপুর
লালগোলা
পদ্মা
নলহাটি
মু র্শি দা বা দ
বহরমপুর
বী র ভূ ম
অজয়
ন দী য়া
কৃষ্ণনগর
ব র্দ্ধ মা ন
বর্দ্ধমান
দামোদর
রানাঘাট
বনগাঁ
বাংলাদেশ
বাঁ কু ড়া
হু গ লী
২৪ প র গ ণা
হাওড়া
কলিকাতা
মে দি নী পু র

গভীরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং বন্দরে জাহাজ আসিবার পথ সুগম হইবে। সুন্দরবনের মধ্য দিয়া খালের সাহায্যে সমুদ্রের সঙ্গে কলিকাতা বন্দরের সংযোগ স্থাপনের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করিতেছেন।

উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় **করতোয়া** সেচ প্রকল্পে করতোয়া নদীতে বাঁধ দিয়া এবং বাঁধের উভয় পার্শ্ব হইতে খাল কাটিয়া ১৩,৮০০ একর (৫,২২০ হেক্টেয়ার) খারিফ এবং ৮,০০০ একর (৩,২০০ হেক্টেয়ার) রবিশস্য উৎপাদনের জমিতে সেচকার্য চলিতেছে।

তিস্তা পরিকল্পনার কার্য এখনও অগ্রসর হইতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় **ব্যাণ্ডেল** ও পুরুলিয়া জেলায় **সাঁওতালদিহি তাপবিদ্যুৎ** কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে, এবং দার্জিলিং জেলায় **জলঢাকা জলবিদ্যুৎ** কেন্দ্র হইতে এই জেলার নানাস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে ব-দ্বীপ অঞ্চলের লোনা-জল নিষ্কাশন করিয়া চাষ-আবাদের জন্য জমি সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বিনা সেচে ঐ সকল জমিতে চীনাবাদাম, তুলা ও সূর্যমুখীর চাষ হইতেছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য **পতিত জমি উদ্ধার** করিয়া কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ও কেলেঘাই অঞ্চলে এইরূপ দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাঠ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ নদীর তলদেশ পলিমাটিতে ভরাট হওয়ায় ইহাদের স্রোতোবেগ কমিয়া গিয়াছে। এমন কি কোন কোন নদী মজিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে এই সকল নদীর জল দুই কূল প্লাবিত করিয়া এক ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। দামোদর ও তিস্তার বন্যা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বন্যার ফলে বালি ও কাঁকর মিশ্রিত মৃত্তিকা আসিয়া চাষের জমি নষ্ট করে। পশ্চিমবঙ্গের নদী উন্নয়ন পরিকল্পনায় নদীগুলিতে বাঁধ দিয়া জলাধার নির্মাণ ও জল নিকাশের জন্য খাল নির্মাণ করা হইয়াছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবার জন্য রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (State Flood Control Board) আছে। ইহা ব্যতীত, জলপাইগুড়িতে বন্যা সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিবার জন্য একটি কেন্দ্র (The Flood Forecasting Centre) আছে। ঝড়বৃষ্টি সম্বন্ধে সতর্কীকরণের জন্য ভারতের পূর্ব উপকূলে রাডার যন্ত্র বসানো হইয়াছে। নদীর পাড় রক্ষা করিবার জন্য পাথর বসাইয়া এবং খাল কাটিয়া নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় তিস্তা নদীর বাম তীরের কিছু জমি রক্ষা করিবার জন্য বাঁধ তৈয়ারি করা হইয়াছে। জলাধার নির্মাণ করিয়া বন্যারোধের চেষ্টা চলিতেছে। প্রয়োজন অনুসারে মাঠে মাঠে জলাধার নির্মাণ করিলে বন্যা ও সেচ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে— যেমন, কুচবিহারের তোর্সা নদীর বাঁধ, জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ার

বাঁধ, দোমহনীতে তিস্তা নদীর বাঁধ, বর্ধমান জেলায় কালনায় ভাগীরথীর দক্ষিণ পাড়ের সংরক্ষণ বাঁধ, হুগলী জেলার চুঁচুড়ার মল্লিকঘাটের নিকট হুগলী নদীর দক্ষিণ পাড়ের সংরক্ষণ বাঁধ, জলপাইগুড়ি শহরের করাল নদের বাঁধ, ২৪ পরগনা জেলার ইছামতী নদীর বাঁধ, বালুরঘাট শহরের সংরক্ষণ বাঁধ প্রভৃতি। নদীতে বাঁধ দিয়া নদীর বাড়তি জলকে বাঁধিয়া রাখিয়া জলের বিরাট আধার তৈয়ারি করিয়া **বন্যানিয়ন্ত্রণ** করা যায়। বাঁধে সঞ্চিত জলের দ্বারা জমিতে সেচের কাজও চলে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে ১.৫৮ কোটি একর (.৬৩ কোটি হেক্টেয়ার) জমি বন্যার উৎপাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার ১৫টি প্রকল্প গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ৭টির কাজ শেষ হয় ১৯৫৫-'৫৬ খ্রীস্টাব্দে। ফলে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙ্গা, শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের ৮২,০০০ একর (৩২.৮ হাজার হেক্টেয়ার) জমি বন্যার কবল হইতে মুক্ত হয়। জল-নিকাশী প্রকল্প সমেত ৭৪টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মধ্যে ৬৭টি প্রকল্পের কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শেষ হয়। ফলে উত্তরবঙ্গে ১.৬১ লক্ষ একর (.৬৪ লক্ষ হেক্টেয়ার) জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল (১৯৬১—'৬৬) পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ৬৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমি বন্যার উৎপাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের বিনিয়োগ ছিল ১৩৮ কোটি টাকা। ১৯৭২-'৭৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে বন্যা-নিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

তৃতীয় পাঠ

যোগাযোগ-ব্যবস্থা

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যাত্রী সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সড়ক, রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ, ডাক ও তার, টেলিফোন, বেতার দেশের প্রধান প্রধান যোগসূত্র। বাণিজ্য-সম্ভার বহন, যাতায়াত, বার্তা-বহন কার্য ইহাদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

কলিকাতা, দুর্গাপুর ও উত্তরবঙ্গ—এই তিনটি রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশন রাজ্যসরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। কলিকাতার রাজপথে মোটর, ট্রাক, লরী, বাস, ট্রাম ইত্যাদি যানবাহন চলাচল করে। ইহাছাড়া, কলিকাতা—দীঘা, কলিকাতা—বহরমপুর, কলিকাতা—রায়গঞ্জ, কলিকাতা—মালদহ, কলিকাতা—পুরুলিয়া, কলিকাতা– কল্যাণী প্রভৃতি পথেও বাস চলিতেছে। উত্তরবঙ্গ পরিবহন কর্পোরেশনের অধীনে বহুসংখ্যক বাস ও ট্রাক চালু রহিয়াছে। শিলিগুড়ি—কলিকাতা, শিলিগুড়ি—গৌহাটি, শিলিগুড়ি—বালুরঘাট প্রভৃতি পথেও যানবাহন চলাচল করিতেছে। দুর্গাপুরেও রাজ্য পরিবহন পর্ষদের কর্তৃত্বাধীনে কয়েকটি বাস চলিতেছে।

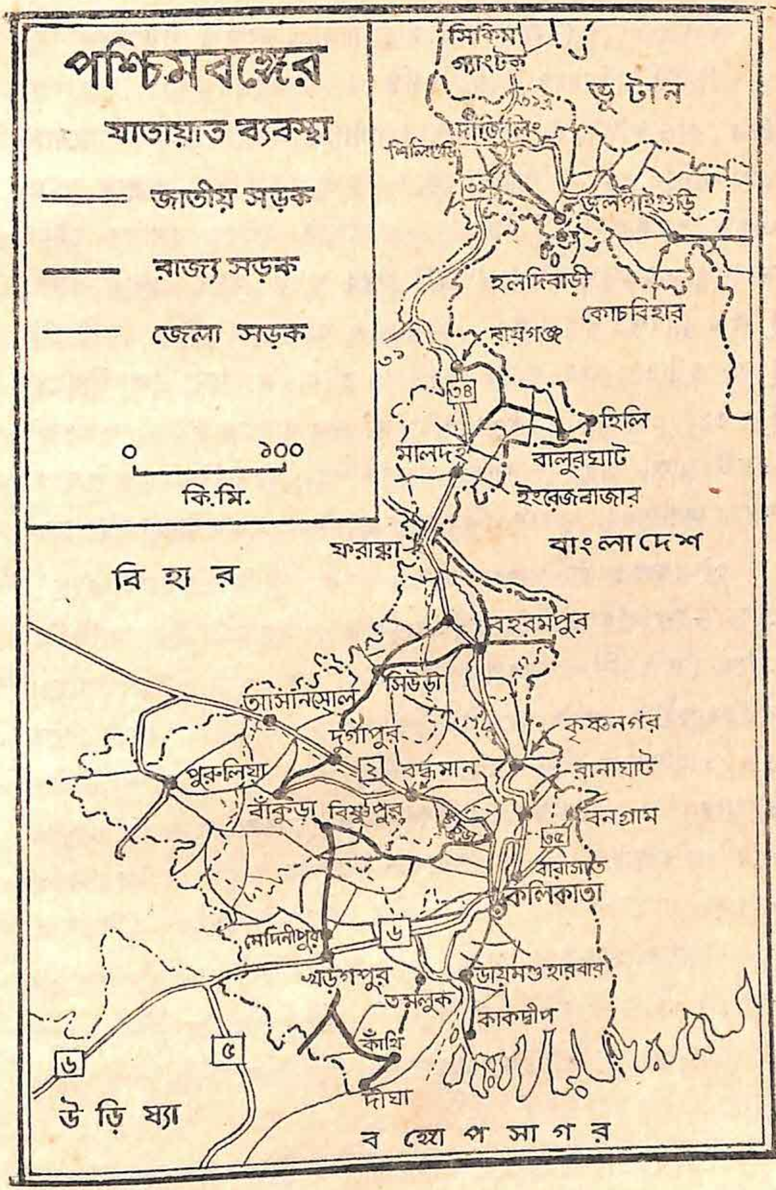
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারলাভের মূলে এই রাজ্যের স্থলপথ, জলপথ ও রেলপথ। শিল্পোন্নতি, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, উপনিবেশ স্থাপন, দেশরক্ষা প্রভৃতির সফলতা নির্ভর করে পরিবহনের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর।

শিল্পবাণিজ্যে পল্লী-অঞ্চলসমূহের সহিত শহরগুলির যোগাযোগ রক্ষার নিমিত্ত নানারকম যানবাহনের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং পথঘাট-সমূহের উন্নতি ও বিস্তৃতি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করা

হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় সড়কের উন্নয়ন হইয়াছে। সড়ক ও পরিবহন উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার তৃতীয় যোজনা পর্যন্ত মোট ৬৫.০৪ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোটর, লরী, বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সী ইত্যাদি নানারকম যানবাহন চলাচল করিবার মত সড়ক নির্মিত হইয়াছে ৫৯,৮২৬ কি-মি. এবং বিবিধ যানবাহনের সংখ্যা মোট ১,৮৪,৫৬৪।

এই রাজ্যের গ্রামের পথে গরু-মহিষের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঠেলাগাড়ী, রিক্সা ইত্যাদি পরিবহনের দায়িত্ব বহন করে। কোন কোন গ্রামের কাঁচা রাস্তায় মোটর, ট্রাক ইত্যাদিও চলাচল করে। কিন্তু শহর ও শহরতলির পাকারাস্তায় মোটরগাড়ী, লরী, ট্রাক, ট্রামগাড়ী, বাস, মিনিবাস, টেম্পো ইত্যাদি মানুষ ও মালপত্রাদি বহন করিয়া যাতায়াত করে।

স্থলপথ—স্থলপথকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) জাতীয়-সড়ক (National Highways) ও (২) রাজ্য-সড়ক (State Highways)। কলিকাতা হইতে দিল্লী, বোম্বাই, নাগপুর ও মাদ্রাজের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে বিভিন্ন **জাতীয় সড়ক**। এই পথগুলি বড় বড় নগর, বন্দর, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদির মধ্যদিয়া নির্মিত হইয়াছে। ইহারাই দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলের সংযোজক পথ। এই রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু পাকারাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে এবং আরও হইতেছে। এই গুলি রাজ্য-সড়ক। এইগুলি হইতে আবার বহু শাখা-পথ (Feeder Roads) গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। গ্রাম্যজীবনকে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য রাস্তার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক জেলার মহকুমা সদর ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য নূতন নূতন রাস্তা তৈয়ারি করা হইতেছে।


পশ্চিমবঙ্গের
যাতায়াত ব্যবস্থা
জাতীয় সড়ক
রাজ্য সড়ক
জেলা সড়ক
০
১০০
কি.মি.
সিকিম
গ্যাংটক
ভূ টান
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
হলদিবাড়ী
কোচবিহার
রায়গঞ্জ
৩৪
হিলি
মালদহ
বালুরঘাট
ইংরেজবাজার
বাংলাদেশ
ফরাক্কা
বি হা র
বহরমপুর
সিউড়ী
আসানসোল
দুর্গাপুর
কৃষ্ণনগর
২
বর্দ্ধমান
রানাঘাট
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
বনগ্রাম
৩৫
বারাসাত
কলিকাতা
মেদিনীপুর
৬
খড়গপুর
ডায়মণ্ড হারবার
তমলুক
কাকদ্বীপ
কাঁথি
৫
দীঘা
উ ড়ি ষ্যা
ব ঙ্গো প সা গ র

জাতীয়-সড়কের মধ্যে কলিকাতা-দিল্লী [নং ২] সড়কের মাত্র ২৪৩ কি-মি. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত। ঐতিহাসিক রাজপথ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কলিকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর ও দিল্লীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। কলিকাতা হইতে সমুদ্রোপকূল দিয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত একটি সড়ক [নং ৬] গিয়াছে। কলিকাতা হইতে খড়্গপুর হইয়া নাগপুর এবং তথা হইতে বোম্বাই বন্দর পর্যন্ত অপর একটি সড়ক [নং ৫] বিস্তৃত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি [নং ৩৪] এবং তথা হইতে কুচবিহার হইয়া আসামে রাস্তা গিয়াছে [নং ৩১]। শিলিগুড়ি হইতে সিকিম রাজ্যের গ্যাংটক পর্যন্ত [নং ৩১ক] একটি রাস্তা আছে। জাতীয়-সড়কগুলির ১,৪৯০ কি-মি. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয়-সড়কের উন্নয়ন হইয়াছে।

এই সকল জাতীয়-সড়ক ব্যতীত রাজ্য সরকার নির্মিত সড়ক আছে। যেমন—উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং-হলদিবাড়ী রাজ্য-সড়ক। ইহা দার্জিলিং হইতে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি হইয়া হলদিবাড়ী পর্যন্ত গিয়াছে। বীরভূম হইতে মেদিনীপুর, সিউড়ী হইতে বহরমপুর, কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার, চুঁচুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রাজ্য-সড়ক নির্মিত হইয়াছে। চতুর্থ যোজনায় কলিকাতা-দুর্গাপুর এক্সপ্রেস-ওয়ে নির্মাণের কার্য শুরু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কলিকাতার সহিত যোগসূত্রকারক কয়েকটি রাস্তা নির্মাণের প্রকল্পও গৃহীত হইয়াছে। যেমন—কলিকাতা-দমদম সুপার হাই-ওয়ে, কলিকাতা-কল্যাণী-ত্রিবেণী রোড, কলিকাতা-খড়্গপুর রোড প্রভৃতি। বাংলাদেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তির ফলে বাংলাদেশের মধ্যদিয়া আগরতলা ও আসামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

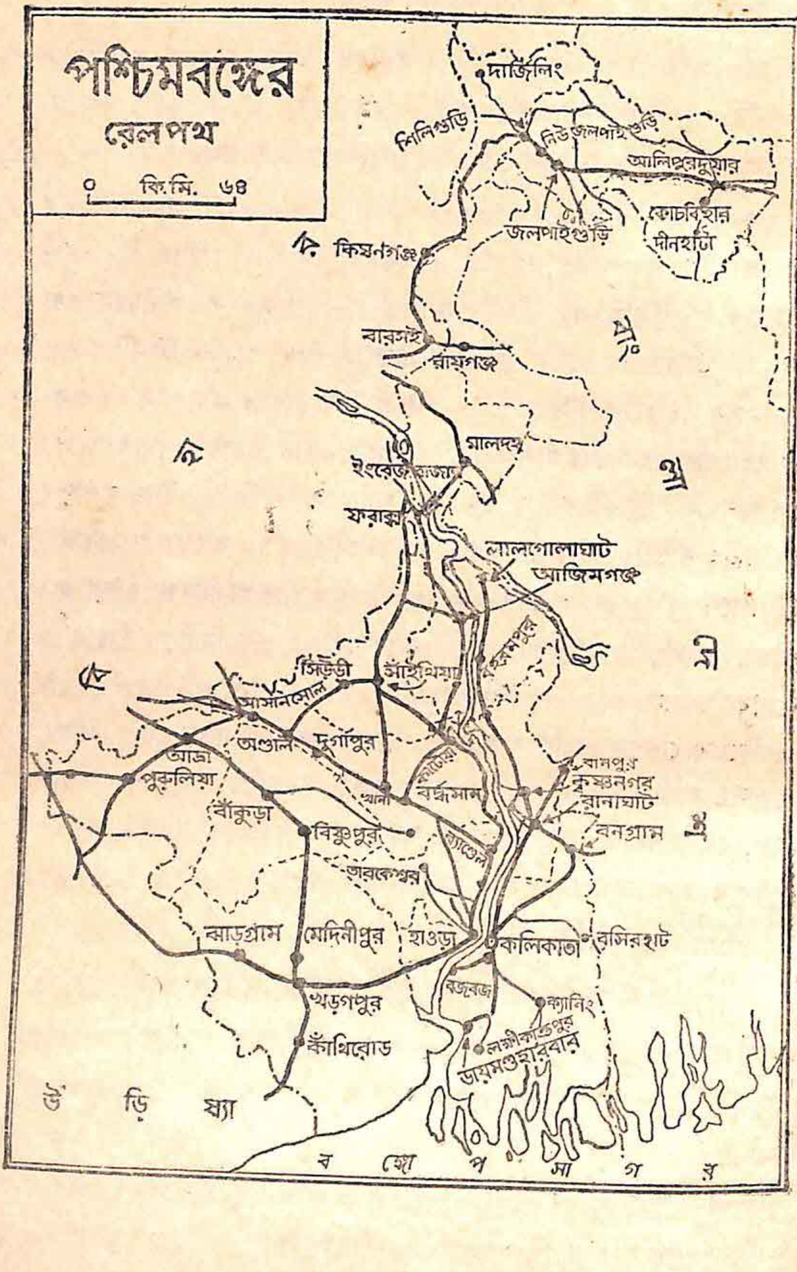
১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই রাজ্যে জাতীয়-সড়ক বিস্তৃত হইয়াছে ১,৪৯০·৯ কি-মি.। রাজ্য-সড়ক বিস্তৃত হইয়াছে

২,৩৩০'৩ কি-মি.। জেলা পরিষদ সমূহের রাস্তার বিস্তার ৩,৭৯৯'৮ কি-মি.। গ্রাম্য-পথের বিস্তার ৩,১৯১'৯ কি-মি.। ১,৫৪১'১ কি-মি. পথে মোটর, লরী ইত্যাদি যানবাহন চলাচল করিতে পারে।

জলপথ—পশ্চিমবঙ্গে অনেক নাব্য নদী ও খাল আছে। এই রাজ্যে নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য ৩,১৭০ কিলোমিটার। নৌকা, ষ্টীমার ও লঞ্চের দ্বারা জিনিসপত্র এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে পরিবহন করা হয়। কলিকাতা হইতে জলপথে ব্রহ্মপুত্র দিয়া ১,২৮০ কি-মি. এবং কানপুর পর্যন্ত গঙ্গা দিয়া ১,০৪০ কি-মি. যাতায়াত করা যায়। জল-সেচের জন্য যে সকল খাল আছে সেগুলিতে ছোট ষ্টীমার ও নৌকা চলে। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিবেণী হইতে দুর্গাপুর পর্যন্ত ১৪৫ কি-মি. দীর্ঘ দুর্গাপুর খালটিও সম্প্রতি নৌবাহনের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। রাজ্যে আভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হইয়াছে। গঙ্গা, হুগলী, রূপনারায়ণ, হলদী, কংসাবতী প্রভৃতি নদীতে ষ্টীমার ও নৌকা চলাচল করে। সুন্দরবন অঞ্চলের মাতলা, ইছামতী প্রভৃতি নদী-গুলিতেও নৌকা যাতায়াত করে। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির মধ্যে তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা প্রভৃতি নৌবাহনোপযোগী। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম-বঙ্গ, বাংলাদেশ ও আসামের মধ্যে নদীপথে পরিবহনের সমস্যা অবগত হইবার জন্য ভারত সরকার একটি নদী-সংস্থা (River Service Committee) গঠন করিয়াছেন।

রেলপথ—স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার রেলপথগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। ভারতে (১৯৭১-'৭২ খ্রীস্টাব্দের হিসাবে) ৬০,০৬৭ কি-মি. রেলপথ আছে। তন্মধ্যে মাত্র ৩'৫ হাজার কি-মি. পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

পূর্ব-রেলপথ—(Eastern Railway)—ইহা ব্রডগেজ রেলওয়ে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, শিয়ালদহ ও আসানসোল বিভাগ ইহার অন্তর্গত।


পশ্চিমবঙ্গের
রেলপথ
০ কি.মি. ৬৪
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি
নিউ জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
কোচবিহার
জলপাইগুড়ি
দীনহাটা
কিষনগঞ্জ
বারসই
রায়গঞ্জ
মালদহ
ইংরেজবাজার
ফরাক্কা
লালগোলাঘাট
আজিমগঞ্জ
বহরমপুর
সাঁইথিয়া
সিউড়ী
আসানসোল
অণ্ডাল
দুর্গাপুর
আদ্রা
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
খানা
বর্দ্ধমান
কাটোয়া
ব্যাণ্ডেল
তারকেশ্বর
কৃষ্ণনগর
রানাঘাট
বনগ্রাম
হাওড়া
কলিকাতা
বসিরহাট
ঝাড়গ্রাম
মেদিনীপুর
খড়গপুর
কাঁথিরোড
বজবজ
ক্যানিং
লক্ষ্মীকান্তপুর
ডায়মণ্ডহারবার
বি
হা
র
উ ড়ি ষ্যা
ব ঙ্গো প সা গ র

এই রেল-পথের প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। রেলপথটি কয়লাখনি ও শিল্পাঞ্চল গুলির মধ্য দিয়া বিস্তৃত। এই রেলপথ দ্বারা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর কলিকাতা ও পূর্ব-ভারতের শিল্পাঞ্চল—আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বার্নপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সংযুক্ত। ইহার মাধ্যমে কয়লা, আকরিক লৌহ, লৌহজাত দ্রব্যাদি, ধান, চাউল, পাট, সার, চা, চিনি পরিবাহিত হয়।

এই রেলপথের এক অংশ কলিকাতা (শিয়ালদহ) হইতে উত্তরে লালগোলা, শান্তিপুর, বানপুর (গেদে), বনগ্রাম এবং দক্ষিণে বসিরহাট, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার, বজবজ পর্যন্ত গিয়াছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগের রেলপথের অনেকাংশ বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (South-Eastern Railway) এই ব্রডগেজ রেলপথের প্রধান কার্যালয় কলিকাতা। ইহা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বিস্তৃত। হাওড়া হইতে খড়্গপুর হইয়া ইহার একটি শাখা উড়িষ্যার মধ্য দিয়া বিশাখাপত্তনম্ বন্দরে গিয়াছে ; একটি শাখা মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, আদ্রা হইয়া গোমো পর্যন্ত গিয়াছে। আদ্রা হইতে একটি রেলপথ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলে বিস্তৃত আছে। আদ্রা হইতে অন্যশাখা পুরুলিয়ার দিকে গিয়াছে। খড়্গপুর হইতে এই রেলপথ পশ্চিমে নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ—এই রেলপথের অধিকাংশই মিটার-গেজ। এই রেলপথ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশে বিস্তৃত। ইহা বিহারের কাটিহার হইতে ডালখোলা হইয়া শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং সেখান হইতে মাদারীহাট, রাজাভাতখাওয়া, আলিপুরদুয়ার হইয়া আসামের গৌহাটি পর্যন্ত গিয়াছে। আলিপুরদুয়ার হইতে কুচবিহার ও দিনহাটা পর্যন্ত একটি শাখা বিস্তৃত

রহিয়াছে। এই রেলপথ প্রধানত চা, কাষ্ঠ, কেরোসিন তৈল, ধান, গম, পাট, চিনি, তামাক ইত্যাদি বহন করে। ফরাক্কা সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে একটি ব্রডগেজ লাইন ঐ সেতুর উপর দিয়া মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্য দিয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা ছাড়া, হাওড়া, আমতা ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে।

ব্রডগেজ রেলপথ ব্যতীত কয়েকটি ন্যারোগেজ লাইন আছে। যথা—দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ, শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপঘাট, বাঁকুড়া-সোনামুখী-রায়নগর, বর্ধমান-কাটোয়া, আহমদপুর-কাটোয়া রেলপথ ইত্যাদি।

বিমানপথ—বিমান-পথে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারত সরকার ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে বিমান-পথ জাতীয়করণ করিয়াছেন। তখন হইতে ভারতের নিজস্ব বিমানপোতগুলি "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন"-এর (I. A. C.) কর্তৃত্বাধীনে দেশের প্রধান নগর ও বিমান বন্দরসমূহের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিমান-বন্দর **দমদম** কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত। ইহা একটি আন্তর্জাতিক বিমান স্টেশন। এই বিমান-বন্দর হইয়া পৃথিবার নানা দেশের বিমান যাতায়াত করে। ইহা ব্যতাত, এই রাজ্যে আরও কয়েকটি বিমান অবতরণ ক্ষেত্র আছে। যথা—শিলিগুড়ির নিটক **বাগডোগরা, আসানসোল, ব্যারাকপুর,** খড়্গপুর প্রভৃতি। বিমান-চালনা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেহালায় রাজ্য সরকার পরিচালিত একটি ফ্লাইং ট্রেণিং ইন্‌স্টিটিউট আছে।

রজ্জুপথ—দুর্গম পার্বত অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া রজ্জুপথের দ্বারা যাত্রী ও মালবহনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দার্জিলিং-বিজনবাড়ি-মনোকেব্‌ল্ রোপ-ওয়ে (Darjeeling-Bijanbari monocable Ropeway) এবং কালিম্পং এর মনোকেব্‌ল্ রজ্জুপথ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বহু সমস্যা প্রপীড়িত বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। কলিকাতার সমস্যা জাতীয় সমস্যা। সেই কারণে কলিকাতার উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। কলিকাতার উন্নয়নের জন্য ১৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করিয়াছেন। উন্নয়ন প্রকল্পগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে নব গঠিত সংস্থা সি. এম. ডি. এ.-র (Calcutta Metropolitan Development Authority) উপর। বস্তীর উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি সাধন, জল নিষ্কাশন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, জঞ্জাল অপসারণ, নূতন এলাকা গঠন, সমাজ কল্যাণ, পথ নির্মাণ ও মেরামত ইত্যাদি নানাবিধ প্রকল্পের দায়িত্ব এই সংস্থার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হইয়াছে। পানীয় জল সরবরাহের নূতন পাইপ লাইন বসানো হইতেছে। টালিগঞ্জে ২৫টি গভীর নলকূপ বসানো হইতেছে। ও ১৩টি জলাধার তৈয়ারি করিয়া পাইপ লাইন বসানো হইতেছে। জল নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী প্রকল্পের কাজও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। কলিকাতা শহরের ট্রাফিক জ্যাম দূরীকরণের জন্য ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের রূপায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। বৃহত্তর কলিকাতার রাস্তাঘাট চওড়া ও মেরামত করিবার কাজ দ্রুত চলিতেছে। এক্ষেত্রে বি. টি. রোড, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, ডায়মণ্ড হারবার রোড প্রভৃতির উন্নয়নের কার্য উল্লেখযোগ্য। হাওড়া স্টেশনের নিকট জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সাব-ওয়ে নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতায় বাসস্থানের অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত নূতন গৃহ নির্মাণ ও লবণহ্রদ পুনরুদ্ধারের প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। ছোট বড় কয়েকটি সেতু নির্মাণের প্রকল্পও এই সংস্থা গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় হুগলী সেতু ও ইহার দুই

পার্শ্ব দিয়া লোক চলাচল ও পরিবহন উন্নতির জন্য এক মেট্রোপোলিটন হাই-ওয়ে প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ভারত সরকার ৫২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিপ্রিণ্টার প্রভৃতির উন্নয়ন এই ব্যবস্থার কর্মসূচী। অনুন্নত অঞ্চলেও ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। টেলিকমিউনিকেশনের কার্যাবলীকে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—স্থানীয় টেলিফোন ব্যবস্থা ও দূরগামী টেলিফোন ব্যবস্থা। বৈদেশিক বা সাগর পারের সঙ্গে যোগাযোগ (The Overseas Communication) ব্যবস্থায় ভারতকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে টেলিপ্রিণ্টার, বেতার টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং আন্তর্জাতিক টেলেক্স প্রথা (Telex System) প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত করা হইতেছে।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম নয়াদিল্লীতে জাতীয় টেলেক্স সার্ভিস (The National Telex Service) শুরু হয়। দেশের বিখ্যাত নগরগুলির সহিত টেলিপ্রিণ্টারের মাধ্যমে সংবাদ সমূহের আদান প্রদান (Teleprinter Exchanges) চলিতেছে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজের হিন্দুস্থান টেলিপ্রিন্টার্স লিঃ রোমান ও দেবনাগরী অক্ষরে ৬,৫৭৮ টেলিপ্রিণ্টার ইউনিট তৈয়ারি করে। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে দেশের ৪৪টি বড় শহরের মধ্যে ১০,১৮০ টেলেক্স যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। বৈদেশিক যোগাযোগ সংরক্ষণের জন্য ভারতে কতকগুলি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র আছে। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা তন্মধ্যে অন্যতম। এতদ্ব্যতীত, বেতার পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধন ব্যবস্থায় (Wireless Planning and Coordination) ভারতের সর্বত্র ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা সহজসাধ্য হইয়াছে। কলিকাতা ভারতের অন্যতম বেতার উপদেশক কেন্দ্র (Monitoring Station)

কলিকাতা, শিলিগুড়ি ও কার্সিয়াং শহরে বেতার কেন্দ্র আছে। সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি জনশিক্ষার মাধ্যম। সম্প্রতি কলিকাতা শহরে একটি **টেলিভিশন** (Television) যন্ত্র বসাইবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ পাঠ

শিল্প

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে সহায়তা করিয়াছে দুইটি কারণ—**কলিকাতা বন্দর ও কয়লা**। কলিকাতা পূর্বভারতের বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র, বিদেশের সঙ্গে সমুদ্র পথে যোগাযোগের দ্বারস্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর ২ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হয়। কয়লার সহায়তায় কলিকাতার আশেপাশে এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে বিভিন্ন শিল্পের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কয়লা ভিত্তিক এক বিরাট শিল্পযজ্ঞ চলিতেছে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে। এখানে কোক চুল্লী ও উপজাত পদার্থের কারখানা, তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র, লেন্স তৈয়ারির কারখানা, প্রেসার ভেসেল, বয়লার ও সিমেন্ট কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, খনির কাজের যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা, সার উৎপাদন কারখানা ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে।

দুর্গাপুরে কোকচুল্লী ও তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনিয়োগ করিয়াছেন ৩৩·৪৬ কোটি টাকা। কোক চুল্লীর গ্যাস হইতে বেনজল পাওয়া যায়। ইহা হইতে বেনজিন, জাইলীন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এখানে **আলকাতরা** চোলাই-এর জন্য একটি প্ল্যাণ্ট বসানো হইয়াছে। ইহাতে দৈনিক ১০০ টন আলকাতরা চোলাই করা হয়। এই প্ল্যাণ্ট হইতে অ্যামোনিয়া লিকার, কার্বলিক অয়েল,

ন্যাপথেলিন, পীচ, স্যাকারিন প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই প্ল্যাণ্ট হইতে গুরু রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যাইতেছে। দুর্গাপুরের কোক চুল্লীর গ্যাসকে নলের সাহায্যে কলিকাতায় প্রবাহিত করিয়া গৃহে ও শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার জন্য গ্যাসগ্রীড (Gas Grid) বসানো হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকারখানাগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই রাজ্যকে প্রধানত চারিটি শিল্পাঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **কলিকাতা** বা **হুগলী নদীতীরের** শিল্পাঞ্চল—কলিকাতা ও উহার নিকটবর্তী ২৪ পরগনা, হুগলী ও হাওড়া জেলার শহরাঞ্চল লইয়া এই শিল্পাঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলে **পাটশিল্প**, রাসায়নিক শিল্প, **কার্পাস বয়নশিল্প ও কাগজ শিল্প** উল্লেখযোগ্য। (২) **আসানসোল-রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল**—এই অঞ্চলে বার্নপুরের **লৌহ ও ইস্পাত** শিল্প, চিত্তরঞ্জনের **রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প** প্রসিদ্ধ। (৩) দুর্গাপুরের **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প** উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির জন্য ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত তৈয়ারি হইতেছে। (৪) **দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের শিল্পাঞ্চল**—দার্জিলিং জেলায় ১৩০টি এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫৫টি চা বাগান এবং তৎসংলগ্ন চা-এর কারখানা আছে। দার্জিলিং-এর চা পৃথিবী বিখ্যাত। **পাট ও চা** শিল্প হইতে এই রাজ্য সমগ্র ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ আছে। শিল্পের জন্য যেমন কৃষি কাঁচামালের যোগানদার, তেমনি শিল্প কৃষিকে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিযন্ত্র ও বৈদ্যুতিক পাম্প ইত্যাদি যোগান দেয়। সুতরাং কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পের উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বিশেষ প্রয়োজন, শিল্পের উন্নতি না হইলে

কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হয়। চট, চিনি, বস্ত্র ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক শিল্পে কাঁচামালের অভাবে মন্দার ভাব দেখা দেয়। বর্তমান সরকার শিল্পকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল কলিকাতা ও ইহার আশেপাশের অঞ্চল, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে দূরবর্তী জেলা ও গ্রামসমূহের কোন আর্থিক লাভ হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারের লক্ষ্য হইল প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া প্রত্যেকটি জেলায় একটি করিয়া শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তোলা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় **চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন** নির্মাণের কারখানা এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা। পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর দুই তীরে **পাট শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যে ১০১টি পাটের কল আছে। উৎকৃষ্ট মানের কাঁচাপাট বাংলাদেশ হইতে আমদানি করিয়া উন্নত ধরনের পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে কাঁচা পাট ও মেস্তার উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৭০ লক্ষ বেল ও ২০ লক্ষ বেল। পাটজাত সামগ্রী প্রস্তুত হয় ১,২২০ টন। এই রাজ্যে ৪০টির অধিক কাপড়ের কল আছে। **কার্পাস বয়ন শিল্পকে** কেন্দ্র করিয়া গেঞ্জি, মোজা, তোয়ালে ইত্যাদি হোসিয়ারী শিল্পও উন্নতিলাভ করিয়াছে।

এই রাজ্যের **রাসায়নিক শিল্পও** গুরুত্বপূর্ণ। হেভি কেমিক্যালস্, ঔষধপত্র, কাচ, মৃৎশিল্প, কাগজ ইত্যাদিতে এই শিল্পের অবদান অপরিসীম। ইক্ষু উৎপাদনের সুবিধা থাকায় বীরভূম জেলায় আহমদপুরে ন্যাশনাল সুগার মিল্‌স্ লিঃ নামে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় ও নদীয়া জেলার পলাশীতে চিনির কল আছে। কিন্তু এই রাজ্যের কলগুলিতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন

অনেক কম। পঞ্চম যোজনায় মুর্শিদাবাদের লালবাগে, মালদহের কালিয়াচকে এবং বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে চিনির কল স্থাপন করিবার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই রাজ্যের কাগজশিল্প, **রবার শিল্প, বৈদ্যুতিক তার নির্মাণ শিল্প** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হাওড়া শহরে প্রায় ৬০০টি ছোটখাট যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ **এ্যালুমিনিয়ম** তৈয়ারির কারখানা আসানসোলের অনুপনগরে (জে. কে. নগর) অবস্থিত। ইহা ভিন্ন, বেলুড়েও একটি এ্যালুমিনিয়ম কারখানা আছে। অদূর ভবিষ্যতে **হলদিয়ায়** একটি সার কারখানা, তৈল শোধনাগার ও একটি পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প কারখানা ও শিলিগুড়িতে পার্বত অঞ্চলের সম্পদ ভিত্তিক একটি শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। পুরুলিয়া জেলাতেও সাঁওতালদিহি-রামকেনালী এলাকার আকরিক সম্পদ ও বিদ্যুতের সাহায্যে শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথম পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে কুটীর শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য ১·২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক লোক কুটীর শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদিগের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সরকার কুটীর শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা বড় কুটীরশিল্প তাঁতশিল্প। ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা, বেগমপুর, শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান তাঁত বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত তাঁতের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কল্যাণীতে সরকারী পরিচালনায় ৫০,০০০টি মাকু সমন্বিত সুতার কল স্থাপিত হয়। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের কাজে অনেক নারী-শ্রমিকও নিযুক্ত আছে। হস্ত-চালিত তাঁত, বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত ও খাদি শিল্পগুলিতে আনুমানিক

৩৫২ কোটি ৬০ লক্ষ মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হয়। এখানে বৎসরে ২৪ লক্ষ পাউণ্ড সুতা তৈয়ারি হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫'৯৯ কোটি গজ (১'০৯ গজ = ১ মিটার) বস্ত্র উৎপাদিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গকে ৬,০০০টি নূতন তাঁত বসাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে (চতুর্থ পরিকল্পনার সমাপ্তিতে) ৮০ লক্ষ বেল (প্রতিবেল = ১৮০ কে-জি.) তূলা উৎপাদিত হয় এবং ৭,৮০০ কোটি মিটার বস্ত্র (মিল ও তাঁত) নির্মিত হয়। মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁত-শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ধুতি (বর্ডার দেওয়া), বিছানার চাদর, তোয়ালে, রঙ্গিন শাড়ি, লুঙ্গি, কাপড় প্রভৃতি তাঁতে উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

রেশমশিল্পের কাজে বিভিন্নভাবে কর্মী নিয়োগের সুযোগ আছে। দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি স্থানে উন্নত জাতের বিদেশী রেশমকীট পালন করিয়া মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার রেশম চাষীদের রেশম কীটের ডিম যোগান দেওয়া হয়।

রেশমশিল্প শিক্ষাদানের জন্য বহরমপুরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। গুটিপোকা পালন, উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন, সুতা পাকাইবার উন্নত পন্থা প্রভৃতি সুষ্ঠু ব্যবস্থার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেশমের উৎপাদন ২'৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৫ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মালবেরি ও অমালবেরি রেশম (এরি ও তসর) উৎপাদন হয়। তুঁতের চাষ ৪'৮ হাজার হেক্টেয়ার এলাকা হইতে ৬'৪ হাজার হেক্টেয়ারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও বীরভূমে উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার কয়েকটি পর্যদ গঠন করিয়াছেন।

চর্মশিল্পের দুইটি বিভাগ—(ক) কাঁচা চামড়া হইতে পাকা চামড়া তৈয়ারি অর্থাৎ ট্যানিং করা এবং (খ) পাকা চামড়ার সাহায্যে

জুতা, সুটকেশ, ব্যাগ ও নানারকম সৌখিন দ্রব্য তৈয়ারি করা। বাটানগরে জুতা নির্মাণের বিরাট কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গের **নারিকেলের ছোবড়ার** শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৮ লক্ষ লোক এই কার্যে নিযুক্ত আছে। হাওড়া (ধূলাগিরি ও লতিবপুর), ২৪ পরগনা (জোকা) ও মেদিনীপুর জেলার বালিসাইতে ছোবড়া শিল্পের শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রীয় নারিকেল ছোবড়া পর্যদের উদ্যোগে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে 'আদর্শ নারিকেল ছোবড়া কারখানা' সহ একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। **লাক্ষা শিল্পের** উন্নয়ন প্রকল্পে পুরুলিয়ার আদিবাসী ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ-লাক্ষা বিতরণ করা হয়। পুরুলিয়ায় ৫টি লাক্ষাকীট উৎপাদন খামার ও ১টি লাক্ষা গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় আরও ৩টি খামার আছে। এখানে লাক্ষার জিনিস ও বার্ণিশ তৈয়ারির একটি শিল্পকেন্দ্রও গঠিত হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে **হস্তশিল্পের** বিশেষ প্রসার হইয়াছে। হস্তশিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে বিক্রয় কেন্দ্র (Emporium) খোলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, শিল্পীদিগের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পের ঐতিহ্য আছে। শোলা ও শাঁখের জিনিস, কাঠ ও মাটির তৈয়ারির খেলনা, মাটির প্রতিমা, কাগজের মণ্ডের মুখোস, বেত ও বাঁশের কাজ, কাঁসা-পিতলের বাসন, সূচীর কাজ, চীনামাটি ও পোড়া-মাটির কাজ, সোনা-রূপার গহনা, হাতীর দাঁতের কাজ, মহিষের শিং ও হাড়ের জিনিস, ছুরি, কাঁচি, কোদাল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ইত্যাদি বহু বিচিত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য হস্তশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সকল শিল্পে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই নিযুক্ত আছে। শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির উন্নতি সাধনের জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে।

কলিকাতার শহরতলি টালিগঞ্জ অঞ্চলে কয়েকটি **চলচ্চিত্র** নির্মাণের স্টুডিও গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা **পর্যটন-শিল্পের** সহায়ক। এই শিল্প সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পক্ষে সহায়ক। প্রতি বৎসর যাহাতে বহুসংখ্যক পর্যটক এদেশে আসেন তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট। আরামদায়ক বাসস্থান, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের উৎসাহ ও আনন্দ দান করে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং, **জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণীর** সংরক্ষিত অরণ্য (Wild Life Sanctuary), **শান্তিনিকেতন**, দীঘা প্রভৃতি এই রাজ্যের আকর্ষণীয় স্থান। চতুর্থ পরিকল্পনায় (১৯৬৯-৭৪) পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের জন্য ৩৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটায় ও কলিকাতার বেলগাছিয়ায় একটি সরকারী **দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান** স্থাপিত হইয়াছে। হরিণঘাটা, টালিগঞ্জ, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়িতে **পোলট্রি ফার্ম** (Poultry Farm) বা হাঁস-মুরগী পালনকেন্দ্র এবং বেলগাছিয়ায় একটি পশুপালন কেন্দ্র আছে।

পঞ্চম পাঠ

বাণিজ্য

বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোন দেশ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সকল দেশে সকল রকম দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়। প্রত্যেক দেশই উহার উৎপন্ন দ্রব্যের কতকগুলি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে এবং বিভিন্ন দেশ হইতে কতকগুলি দ্রব্য আমদানি করে। **আমদানি ও রপ্তানির** মাধ্যমে বর্তমানে ভারত প্রধানত

জলপথে পৃথিবীর নানাদেশের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারই নাম **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য** (International Trade)। মূলত এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতির সঙ্গে **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের** (Internal Trade) প্রকৃতির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যে কারণে বিদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে সেই কারণেই ভারতের অভ্যন্তরে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। সকল রাজ্যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের সমান দক্ষতা বা সুযোগ-সুবিধা থাকে না। যেমন, বোম্বাই-এর ন্যায় বস্ত্র শিল্পের সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম-বঙ্গের নাই, আবার পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় পাট শিল্পের সুযোগ-সুবিধা বোম্বাই-এর নাই। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু অন্য রাজ্যে রপ্তানি করিয়া ভিন্ন রাজ্য হইতে বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করে।

প্রত্যেক দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য উহার বিভিন্ন সম্পদ (বনজ, খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পজ) এবং বন্দরের উন্নতির উপর নির্ভর করে। **কলিকাতা** পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। ইহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। বোম্বাই ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর, বোম্বাই বন্দরের আমদানি বেশী। কিন্তু কলিকাতা বন্দরের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি ব্যবসায় প্রধান। সমগ্র পূর্বভারত ইহার **পশ্চাদ্ভূমি**। পশ্চাদ্ভূমি রেলপথ, জলপথ ও সড়ক দ্বারা সংযুক্ত থাকিবার ফলে পণ্য দ্রব্য পরিবহনের খুব সুবিধা আছে। রপ্তানি হইতে ভারত সরকারের যত আয় হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ আসে পশ্চিমবঙ্গ হইতে। বাণিজ্য-পণ্যের মধ্যে পাটই সর্বাপেক্ষা অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বৎসরে গড়ে ৯ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়। পাটের সঙ্গে মেস্তা মিশাইয়া কাঁচাপাটের চাহিদা মিটিলেও উৎকৃষ্ট পাটের অভাব এখনও রহিয়াছে। সেই কারণে বাংলাদেশ হইতে উৎকৃষ্ট পাট

আমদানি করিয়া পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। ঐ সকল পাটজাত দ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দে উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ১১ হাজার টন। তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে চা উৎপন্ন হয় ১৮·৯৭ লক্ষ কিলোগ্রাম। এই পরিকল্পনা কালে কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে চা রপ্তানি হয় ১২৩·৬৩ কোটি টাকা মূল্যের। দার্জিলিং-এর চা বিদেশে প্রচুর রপ্তানি হয়। প্রায় ৳ অংশ চা যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হয়। তথা হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পুনর্রপ্তানি হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের চট, চামড়া; বিহার ও উড়িষ্যার লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, গালা, তৈলবীজ, তামাক; উত্তরপ্রদেশের তূলা, গম, তৈলবীজ, রবিশস্য এবং মধ্যপ্রদেশের তূলা ও কাঠ কলিকাতা বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। কলকব্জা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, শৌখিন দ্রব্য, খনিজ তৈল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান আমদানি দ্রব্য। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমায় হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত হলদিয়া একটা নূতন বন্দর। এই বন্দরের দ্বারা কলিকাতা বন্দরের উপর চাপ কিছু কম হইবে।

স্থলপথে নেপাল, সিকিম ও ভুটানের সহিত পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য চলে। রেলপথে ও জলপথে (নৌকা, স্টীমার ইত্যাদির সাহায্যে নদী পথে) বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলে। এতদ্ব্যতীত, রেলপথে ও জলপথে ভিন্ন রাজ্যের সহিতও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য চলে। যে কোন দেশের আর্থিক উন্নতিতে রপ্তানি বাণিজ্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। রাজ্যের বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) রপ্তানি বাণিজ্যে নানাভাবে সাহায্য, উৎসাহ ও পরামর্শ দান করেন।

১৯৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রায় ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়। নিম্নে কয়েকটি রপ্তানি দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ দেওয়া হইল।

১।	কয়লা ও কোক	১২,২৮,৮৭,৩২৯ কুইন্ট্যাল
২।	ফল (শুষ্ক)	৩,০১১ ,,
৩।	কাচ	৩,৩৫,৪৫৯ ,,
৪।	পশুচর্ম (কাঁচা ও পাকা)	১,৫৭,৮৬১ ,,
৫।	পাট ও পাটজাত দ্রব্য	২১,৩২,৩৪৪ ,,
৬।	লৌহ ও ইস্পাতের বার, পাত ইত্যাদি	১,৪৬,৪৬,২৯২ ,,
৭।	তৈলবীজ	৯,৪৮৭ ,,
৮।	চা	৬,২০,০০৯ ,,

পরিশিষ্ট

বিবিধ প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

১। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান, আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ ও পার্বত দেশগুলির সহিত সম্বন্ধ পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার উন্নতির পক্ষে কিরূপে সহায়তা করিতেছে তাহা বুঝাইয়া দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

১। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বিভাগ? উহাদের নাম কর এবং উহাদের অন্তর্গত জেলাগুলির নাম কর।

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়া জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

(ক) ভূ-প্রকৃতি, (খ) জলবায়ু, (গ) স্বাভাবিক উদ্ভিদ, (ঘ) কৃষি, (ঙ) শিল্প, (চ) অধিবাসী।

৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া দার্জিলিং জেলার পার্বত অঞ্চলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

(ক) ভূ-প্রকৃতি (খ) জলবায়ু, (গ) কৃষি ও (ঘ) শিল্প।

৪। নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান ও গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর :—
জলদাপাড়া, আলিপুরদুয়ার, বকসা, কার্সিয়াং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, বাগডোগরা।

দ্বিতীয় পাঠ

১। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

(ক) ভূ-প্রকৃতি, (খ) জলবায়ু, (গ) জলসেচ, (ঘ) কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ উৎপন্ন দ্রব্য।

২। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে কোন্ কোন্ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিল্পগঠনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ কি তাহা বর্ণনা কর :—

বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, আহমদপুর, ঝালদা, বিষ্ণুপুর।

তৃতীয় পাঠ

১। পশ্চিমবঙ্গের পলিগঠিত সমভূমিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগের নাম কর এবং কোন্ কোন্ জেলা কোন্ ভাগের অন্তর্ভুক্ত তাহা বল।

২। সমভূমি অঞ্চলের নদ-নদীগুলির নাম কর এবং উহাদের গতিপথ বর্ণনা কর।

৩। নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের উপর নির্ভর করিয়া গাঙ্গেয় সমভূমির এক সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

(ক) জলবায়ু, (খ) কৃষি ও (গ) শিল্প।

৪। নিম্নলিখিত স্থানগুলির গুরুত্ব বর্ণনা কর :—

কলিকাতা, দমদম, শিবপুর, কৃষ্ণনগর, কল্যাণী, মুর্শিদাবাদ, রায়গঞ্জ, কুচবিহার।

চতুর্থ পাঠ

১। ব-দ্বীপ কাহাকে বলে? গঙ্গার ব-দ্বীপকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগের নাম কর এবং প্রত্যেক ভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও বালিয়াড়ি কি? এইগুলি কোথায় দেখা যায়?

৩। উপকূলের নিম্নভূমির জলবায়ু বর্ণনা কর।

৪। সুন্দরবন অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুর বিবরণ দাও।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া উপকূলের নিম্নভূমির ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

নারিকেল চাষ, লবণ উৎপাদন, মৎস্য শিকার, কাষ্ঠ শিল্প।

৬। কি কারণে বিখ্যাত?

হলদিয়া, দীঘা, ডায়মণ্ড হারবার, সাগরদ্বীপ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কি? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

প্রথম পাঠ

১। বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কাহাকে বলে ? পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। নিম্নলিখিত নদী পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। নদী প্রসঙ্গে-ফরাক্কা বাঁধের গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর :—

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, কংসাবতী পরিকল্পনা, ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা।

৩। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দাও। পশ্চিমবঙ্গের জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের নাম কর।

দ্বিতীয় পাঠ

১। পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

তৃতীয় পাঠ

১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার কিরূপ উন্নয়ন হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দাও।

চতুর্থ পাঠ

১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোয়নের বিবরণ দাও।

২। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্প, কাগজশিল্প ও নারিকেল ছোবড়ার শিল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। পশ্চিমবঙ্গের তাঁত-শিল্প ও রেশম-শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। কুটীর শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি কাজ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা কর।

৪। নিম্নলিখিত শিল্পগুলির সম্বন্ধে বল :—

গালা শিল্প, মৃৎশিল্প, পোল্ট্রি ফার্ম, পশুপালনকেন্দ্র, মৎস্যশিকার, দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি নির্মাণ।

পঞ্চম পাঠ

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাহাকে বলে ? ইহারা কি মূলত এক ? এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বুঝাইয়া দাও।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

[নিম্নে কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হইল। শিক্ষকগণ ইচ্ছানুযায়ী গুণের দিক্ হইতে প্রশ্নগুলির মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংযোজন করিতে পারেন।]

প্রথম অধ্যায়

১। অশুদ্ধ শব্দটি/শব্দগুলি কাটিয়া দাও :—

(i) পশ্চিমবঙ্গের পূর্বে আসাম/সিকিম।

(ii) নেপালের রাজধানী থিম্ফু/কাঠমণ্ডু।

(iii) শিলিগুড়ি হইতে মোটর পথে সিকিমে/ভুটানে যাওয়া যায়।

(iv) ভুটান ও সিকিম শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত/উন্নত নহে।

(v) বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান/শিল্পপ্রধান রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) জলপাইগুড়ির উত্তরাংশে — পর্বত অবস্থিত।

(ii) বর্ষাকালে — নদীতে ভীষণ বন্যা হয়।

(iii) জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া — নদী প্রবাহিত হইতেছে।

(iv) জলপাইগুড়ি জেলায় — কয়লা পাওয়া যায়।

(v) — জলপাইগুড়ি জেলার সর্বপ্রধান শিল্প।

(vi) জলপাইগুড়ি জেলার কুটীর শিল্পের মধ্যে — শিল্প উল্লেখ-যোগ্য।

(vii) ভ্রমণকারীরা — বন্যজন্তু দেখিতে যায়।

(viii) — একটি বিখ্যাত রেলস্টেশন।

২। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'হাঁ' এবং অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'না' শব্দটি লিখ :—

(i) সিংগলীলা পর্বতের শৃঙ্গ সান্দাকফু।
(ii) জলঢাকা প্রকল্পে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে।
(iii) গ্রীষ্মকালেই দার্জিলিং-এ নাতিশীতোষ্ণ মনোরম আবহাওয়া থাকে।
(iv) গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং-এ প্রচুর বারিবর্ষণ হয়।
(v) কালিম্পং শহরের জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর।
(vi) হিমালয়ের গাত্রে শাল, সেগুন প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে।
(vii) মংপুতে বড় এলাচির চাষ হয়।
(viii) চা-শিল্পে দার্জিলিং-এর স্থান প্রথম।
(ix) দার্জিলিং-এ বৃহদায়তন শিল্প নাই।
(x) দার্জিলিং-এ শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই।

দ্বিতীয় পাঠ

১। নিম্নের প্রতি সারিতে বিজাতীয় শব্দটির নীচে দাগ দাও :—

(i) বাঘমুণ্ডি, অযোধ্যা, শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, দ্বারকেশ্বর।
(ii) ব্রাহ্মণী, পলাশ, কুমারী, শিলাবতী, রূপনারায়ণ।
(iii) শিমুল, কুসুম, বকুল, মহুয়া, অজয়।
(iv) গম, কলাই, সরিষা, কেওলিন, ইক্ষু।
(v) ফায়ার ক্লে, গ্রাফাইট, ডলোমাইট, তিসি, উলফ্রাম।
(vi) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প. রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প, তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেশম শিল্প।
(vii) বোলপুর, ঝালদা, ঝাড়গ্রাম, ওরাও, শান্তিনিকেতন।
(viii) সাঁওতাল, লোধা, বিশ্বভারতী, বীরহোড়, মুণ্ডা।

তৃতীয় পাঠ

১। নিম্নলিখিত যে কারণটির সর্বাপেক্ষা অধিক ভৌগোলিক সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইবে তাহার পাশে ✓ চিহ্নটি দাও :—

(ক) ফরাক্কা বাঁধ তৈয়ারি হইয়াছে, কারণ :—

(i) গঙ্গানদীর মূল স্রোত পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যাইতেছে।

(ii) ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে পলি জমিয়া চর পড়িতেছে।

(iii) মৃতপ্রায় নদীগুলি জলপূর্ণ হইয়া সজীব হইবে।

(iv) কলিকাতা বন্দরের উন্নতি হইবে।

(খ) সমতলভূমির জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। কারণ :—

(i) সমতলভূমিতে গ্রীষ্ম ও শীতের তাপের পার্থক্য গড়ে ১৭° সে।

(ii) পার্বত অঞ্চলের তুলনায় বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম।

(iii) শীত ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য বেশী নহে এবং মৌসুমী বায়ুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

(iv) পার্বত অঞ্চল অপেক্ষা সমতলভূমিতে তাপের মাত্রা অধিক এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্য শস্য ধান। কারণ :—

(i) সমতলভূমির পলিমাটি ও জলবায়ু ধান চাষের পক্ষে উপযোগী।

(ii) এঁটেল মাটি ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ধান চাষের পক্ষে উপযোগী।

(iii) ধানের চাষ বেশী হয় বলিয়া ইহাই এই রাজ্যের প্রধান খাদ্য শস্য।

(iv) উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু ধান চাষের পক্ষে উপযোগী।

(ঘ) পাটশিল্প সমভূমি অঞ্চলের প্রধান শিল্প। কারণ :—

(i) কলিকাতা এই শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র।

(ii) হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটের কল আছে।

(iii) কলিকাতা বন্দরের সহিত যোগাযোগ এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়ক।

(iv) পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিবার সুবিধা আছে।

চতুর্থ পাঠ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) ২৪ পরগনা জেলা — ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) — সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ।

(iii) নদীর নূতন গতিপথ হইতে বিচ্ছিন্ন বাঁককে — বলে।

(iv) রায়মঙ্গল — পড়িয়াছে।

(v) কাঁথির সমুদ্রোপকূল —।

(vi) কাঁথির সমুদ্রোপকূলে — আছে।

(vii) — নিম্নচাপের ফলে সমুদ্রোপকূলে বারিবর্ষণ হয়।

(viii) — হইতে মোম ও মধু সংগ্রহ করা হয়।

(ix) সমুদ্রোপকূলের লোনামাটিতে নারিকেল, সুপারি, তাল প্রভৃতি — বৃক্ষ জন্মে।

(x) হলদিয়া বন্দরে একটি — স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

(xi) মেদিনীপুর জেলার দীঘা হইতে জুনপুট পর্যন্ত —।

(xii) দীঘায় — শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

(xiii) — ট্যুরিস্ট লজ আছে।

(xiv) কাঁথি মহকুমায় সমুদ্রজল হইতে — উৎপাদন করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

১। যে কারণটি অধিক যুক্তিসঙ্গত তাহার নীচে দাগ দাও :—

(i) পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যার কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি/অনুন্নত কৃষি-ব্যবস্থা।

(ii) দেশ-বিভাগের কুফল উদ্বাস্তু সমস্যা/খাদ্য-সমস্যা।

(iii) প্রথম পরিকল্পনায় কুটীর শিল্পের/বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(iv) দুর্গাপুরে কোক-চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে কয়লা/তাপ-বিদ্যুতের উপর নির্ভর করিয়া।

(v) ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে তৃতীয়/চতুর্থ পরিকল্পনায়।

(vi) চতুর্থ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ/খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি রহিয়াছে।

২। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'হাঁ' শব্দটি লিখ এবং অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'না' শব্দটি লিখ।

(i) পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার শালবাঁধ খাল উল্লেখযোগ্য।

(ii) পশ্চিমবঙ্গে চাষ-যোগ্য জমির পরিমাণ ৫৫ লক্ষ হেক্টেয়ার।

(iii) দুর্গাপুরে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে।

(iv) কোনারে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

(v) তিলপাড়ায় একটি সেচ বাঁধ নির্মিত হইয়াছে।

(vi) মুর্শিদাবাদ জেলায় তিলডাঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

(vii) সাঁওতালদিহিতে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।

(viii) গঙ্গা বাঁধের দ্বারা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় জলসেচের পক্ষে সুবিধা হইবে।

দ্বিতীয় পাঠ

১। অশুদ্ধ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কাটিয়া দাও :—

(i) ঝড়বৃষ্টি সম্বন্ধে সতর্কীকরণের জন্য পূর্ব উপকূলে টেলিফোন/রাডার যন্ত্র বসানো হইয়াছে।

(ii) দামোদর/ইছামতী নদীর বন্যা ভয়াবহ।

(iii) বাঁধে সঞ্চিত জলের দ্বারা সেচের/বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চলে।

(iv) খাল কাটিয়া নদীর প্রবাহ/বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(v) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৭৪টি/৬৭টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়।

তৃতীয় পাঠ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রধান কার্যালয় —।

(ii) তৃতীয় পরিকল্পনায় — সড়কের উন্নয়ন হইয়াছে।

(iii) কলিকাতায় সি. এম. ডি. এ. — রেলপথ নির্মাণের কাজ করিতেছেন।

(iv) পশ্চিমবঙ্গে নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য — কিলোমিটার।

(v) দমদম — বিমানপথের একটি প্রসিদ্ধ স্টেশন।

(vi) — উন্নয়নে পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

(vii) ভারতকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত আন্তর্জাতিক — প্রথা দ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছে।

(viii) দেশের বিখ্যাত নগরগুলির সহিত — মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান করা হয়।

(ix) — বৈদেশিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র।

(x) শ্রীনগর একটি বেতার — কেন্দ্র।

চতুর্থ পাঠ

১। বামদিকের ও ডানদিকের মিল বুঝিয়া বামদিকের সংখ্যাটি ডানদিকের বন্ধনীতে বসাও :—

(i) পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে সহায়তা করিয়াছে	(ক) তাঁত শিল্প ( )
(ii) কোক চুল্লী ও উপজাত পদার্থের কারখানা আছে	(খ) চিত্তরঞ্জনে ( )

(iii)	কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের উল্লেখ-যোগ্য শিল্প	(গ) কয়লা	( )
(iv)	রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা আছে	(ঘ) দুর্গাপুরে	( )
(v)	চিনির কল আছে	(ঙ) হলদিয়ায়	( )
(vi)	এ্যালুমিনিয়ম তৈয়ারির কারখানা আছে	(চ) কল্যাণীতে	( )
(vii)	তৈলশোধনাগার কারখানা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে	(ছ) ধনেখালিতে	( )
(viii)	পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা বড় কুটীর শিল্প	(জ) পাটশিল্প	( )
(ix)	সুতার কল স্থাপিত হইয়াছে	(ঝ) অনুপনগরে	( )
(x)	তাঁত বস্ত্র তৈয়ারি হয়	(ঞ) পলাশীতে	( )
(xi)	নারিকেলের ছোবড়ার কারখানা আছে	(ট) জলপাই-গুড়িতে	( )
(xii)	পোলট্রি ফার্ম আছে	(ঠ) উলুবেড়িয়ায়	( )

পঞ্চম পাঠ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) ভারত পৃথিবীর নানাদেশের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারই নাম —।

(ii) সমগ্র পূর্বভারত কলিকাতা বন্দরের —।

(iii) — এর চা সর্বোৎকৃষ্ট।

(iv) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি কলিকাতা বন্দরের — দ্রব্য।

(v) — একটি নূতন বন্দর।

(vi) রাজ্যের বাণিজ্য — রপ্তানি বাণিজ্যে পরামর্শ দেন।

(vii) — সর্বাপেক্ষা অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

EASTERN PUBLISHERS

"This book has been printed on paper allotted by Government of India at concessional rate."

মূল্য টা. ২·৫৫